প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

মূল্য—পনেরো টাকা

প্রচ্ছদ—প্রণবেশ মাইতি

শ্রীমাধুরী দত্ত ৪এ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলিকাতা-১০ থেকে প্রকাশ করেছেন। এবং শ্রীসুধাতোষ বসু ইম্প্রেশন, ৩০।৬।২এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬ থেকে ছেপেছেন।

নিবেদন

বর্তমান লেখক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে আবেদন করেছে :

"During my search among the records preserved in the West Bengal State Archives in connection with my research work on Bengali literature I came to know that certain confidential papers relating to "Pather Dabi" are kept in your custody.

"Pather Dabi" was proscribed in 1927 and the ban was lifted in 1939 and the correspondence in the matter, in all probability, cover the period 1926-40.

I shall be grateful if you kindly allow me access to the papers mentioned above."

অতঃপর স্বরাষ্ট্রদপ্তরের সহায়তায় 'পথের দাবী' সম্পর্কে বিস্তর নথিপত্র দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। দিনের পর দিন পরিশ্রমের ফলে অনেক মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করেছি।

মৎসংগৃহীত সকল উপকরণ স্বরাষ্ট্রদপ্তর, ১৯৩৬ সালের ৬ জানুআরি, গোয়েন্দাবিভাগে পাঠিয়েছে। গোয়েন্দাবিভাগ থেকে সকল উপকরণ স্বরাষ্ট্রদপ্তরে ফেরত এসেছে ১৯৩৬ সালের ফেব্রুআরি মাসের মাঝামাঝি। অতঃপর স্বরাষ্ট্রদপ্তর, ১৯৩৬ সালের ১৯ ফেব্রুআরি, মৎসংগৃহীত সকল উপকরণ আমাকে প্রত্যর্পণ করেছে। সেদিন কিংবা তার আগে আর কেউ স্বরাষ্ট্রদপ্তরের নথিপত্র থেকে 'পথের দাবী' সম্পর্কে একটি অক্ষরও নিয়ে যাননি।

প্রধানত স্বরাষ্ট্রদপ্তরের অপ্রকাশিত নথিপত্র অবলম্বনে লিখিত 'ব্রিটিশ আমলে পথের দাবী' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার ১৯৩৬ সালের ৩ এপ্রিলের সংখ্যায়। 'দেশ'

পত্রিকার উক্ত সংখ্যা কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৬ সালের ৩০ মার্চ। 'দেশ' পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যাই মুদ্রিত প্রকাশকালের দিনকয়েক আগে প্রকাশিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও 'দেশ' পত্রিকার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

'ব্রিটিশ আমলে পথের দাবী'র সূত্রে অনিবার্যভাবে রবীন্দ্র-শরৎ প্রসঙ্গ এসে পড়ে। অতএব, 'রবীন্দ্র-শরৎ প্রসঙ্গ' নামে একটি রচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গ্রন্থাকারে সন্নিবদ্ধ করার সময়ে 'ব্রিটিশ আমলে পথের দাবী'তে অনেক নতুন অংশ সংযুক্ত হয়েছে।

শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুগ্রহে, আমার সৌভাগ্যবশত, বর্তমান গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের একখানা ফোটো, 'পথের দাবী'র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার অংশ, রবীন্দ্রনাথের একখানা চিঠি এবং শরৎচন্দ্রের একখানা চিঠির প্রতিলিপি ব্যবহার করা সম্ভব হল। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত শরৎচন্দ্রের ফোটোখানা শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'পথের দাবী' যেদিন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, সেদিন তুলেছেন। তাঁর ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগোপালচন্দ্র রায় সঙ্কলিত পত্রাবলীর কাছেও ঋণী রইলাম।

কলকাতা

ইন্দ্র মিত্র

ব্রিটিশ আমলে 'পথের দাবী'

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়।*

এ-বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলেন যে 'পথের দাবী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেই বাজেয়াপ্ত হবে। তাই কোনও বিখ্যাত প্রকাশকই বইখানা প্রকাশ করতে রাজী হননি। শেষ পর্যন্ত 'পথের দাবী'র প্রকাশক হলেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র সেসময়ে একদিন উমাপ্রসাদকে বললেন—যদি জেল হয়, কি করবে?

উমাপ্রসাদ বললেন—হলে তো আর একা প্রকাশকের হবে না, লেখকেরও হবে। দুজনে জেলে একসঙ্গে থাকব—আপনার সঙ্গে থাকা,—সে তো মহা ভাগ্যের কথা।

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন—দেখো, আমার গড়গড়াটা যেন সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।

*দ্রষ্টব্য: 'বঙ্গবাণী'—ফাল্গুন, ১৩২৯, পৃ. ৫-২১; চৈত্র, ১৩২৯, পৃ. ১৫২-৬৭; বৈশাখ, ১৩৩০, পৃ. ২৯১-৯৮; আষাঢ়, ১৩৩০, পৃ. ৬০৯-৩২; শ্রাবণ, ১৩৩০, পৃ. ৭৫৭-৬৭; ভাদ্র, ১৩৩০, পৃ. ১০৯-২৭; অগ্রহায়ণ, ১৩৩০, পৃ. ৫৩০-৪০; পৌষ, ১৩৩০, পৃ. ৬৬৪-৭৬; মাঘ, ১৩৩০, পৃ. ৭৭৯-৯৪; ফাল্গুন, ১৩৩০, পৃ. ১২৫-২৮; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১, পৃ. ৪৯৯-৫১৩; আশ্বিন, ১৩৩১, পৃ. ২৪৭-৫৬; কার্তিক, ১৩৩১, পৃ. ২৭৩-৮০; পৌষ, ১৩৩১, পৃ. ৬৪৪-৫৪; মাঘ, ১৩৩১, পৃ. ৭৭৮-৮৬; বৈশাখ, ১৩৩২, পৃ. ৩৪৭-৫৩; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২, পৃ. ৫২১-৩০; ভাদ্র, ১৩৩২, পৃ. ১২১-৩১; কার্তিক, ১৩৩২, পৃ. ৩৭৫-৯০; অগ্রহায়ণ, ১৩৩২, পৃ. ৫১৬-২৩; পৌষ, ১৩৩২, পৃ. ৬২৭-৩৫; মাঘ, ১৩৩২, পৃ. ৭৭১-৮১; ফাল্গুন, ১৩৩২, পৃ. ১১৪-২০; বৈশাখ, ১৩৩৩, পৃ. ২৫৩-৬৮।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ থেকে দেখা যাচ্ছে: 'পথের দাবী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ অথবা ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে (৩১ অগস্ট ১৯২৬), ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ফর্মা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪২৬, দাম তিন টাকা, ছাপা হয়েছে ২১০০ কপি; মুদ্রাকর—সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কটন প্রেস, ৫৭, হ্যারিসন রোড, কলকাতা; প্রকাশক—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৭৭, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোড, ভবানীপুর, কলকাতা।

উত্তরকালে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখছেন: "১৮ই ভাদ্র ১৩৩৩ (৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৬)। পথের দাবী বই আকারে তার আগের দিন বার হয়েছে। শরৎচন্দ্র সে-রাত্রিতে আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে ছিলেন। দুজনে সারারাত জেগেছি। কাছে বসে কত গল্প করেছি, কত গল্প শুনেছি।"

পুলিশ কমিশনার, ১৯২৬ সালের ২৩ নভেম্বর (চিঠির নম্বর: ৫২৭২ ডিডি), বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের চীফ সেক্রেটারিকে লিখেছেন:

"I have the honour to forward herewith, for the cosideration and orders of Government, the translation of objectionable passages from the book entitled "Pather Dabi"—written by Sarat Chandra Chatterjee—a well-known novelist of Bengal, printed by Satyakinkar Banerji from the Cotton Press, 57, Harrison Road and published by Umaprasad Mukherji from 77, Ashutosh Mukherjee Road, Bhowanipore, Calcutta. A printed copy of the book was sent to the Public prosecutor, Calcutta, for his opinion and he advises that the book is liable to be proscribed under section 99A of the Criminal Procedure Code and the author and the Printer to be prosecuted under Section 124A of the Indian Penal Code. The translation may kindly be returned after perusal."

এই চিঠিখানার সূত্রে চীফ সেক্রেটারি, ১৯২৬ সালের ২৫ নভেম্বর, 'পথের দাবী' সম্পর্কে লিখেছেন :

"This is a poisonous production but as an order under Section 99A can be questioned in the High Court I think we should have the Advocate General's opinion whether a prosecution would lie under Section 124A I. P. C."

স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র তখন বাঙলার অ্যাডভোকেট-জেনারেল। তিনি, ১৯২৬ সালের ১১ ডিসেম্বর, লিখেছেন :

"I have carefully read the book "Pather Dabi". The author is one of the foremost novelists in Bengal and is widely read. His previous novels dealt with social problems. This is, to my knowledge, the first book dealing with political matters. As a novel, the book is inartistic. But it has considerable literary merit. Certain Political doctrines are propounded with force and skill. The caution observed in the earlier part of the book has not been maintained in the latter part.

The title "Pather Dabi" is explained at the top of p. 127. A literal translation of the title is—"the right of unobstructed passage." At p. 127, the explanation is as follows :— "claiming the full rights of humanity to proceed along the path of manhood we shall go on by breaking down all obstacles, so that those who come after us may walk on without molestation, and no one may obstruct their free and unhampered progress. This is our vow." In order to attain this end, whatever it may mean, the hero of the book, namely, Sabyasachi or Doctor starts a club or association, named "Pather Dabi", with Sumitra as President and Bharati as Secretary. The hero is a revolutionary who is avoiding arrest by the police.

There are three dominant ideas which run through the book. First, that in a dispute between Indians on the one kand, and the Europeans or Eurasians on the other hand, the former get no justice in the courts in India. Secondly, that the cupidity of the European mill owners has brought about grinding poverty of the labourers in India and brutalized them. And thirdly, that the British Government in this Country is run in the interests of British merchants, resulting in inhuman exploitation and reducing the people to a state of abject poverty and helplessness Towards the end of the book, the hero works himself up to a state of frenzy, throws away all restraint and preaches pure bolshevism. He says he is out to destroy Christian civilization and western civilization.

There are many passages in the book in which the author tries to evade the law. For instance, the hero says he has no ill feeling towards the king or the king's officers and that it is a delusion to think that to strike at them is to strike at the root of **raj-sakti** or sovereign power, which he is out to destroy. Then he explains that **raj-sakti** means the sovereignty of wealth over poverty, of power over weakness, which, according to him is the foundation of western civilization, and not political sovereignty. Again, in various passages he is declaiming against the English people, as distinguished from the Government in British India. But reading the book, as a whole, I have no doubt that the author has failed to conceal his real intention, which is to excite hatred and disaffection towards the Government established by the English in India.

At p.48 Ramdas, a member of the Association "Pather

Dabi", who was smarting under a sense of injustice in a court of law says—"A real man knows what would be the result of a case between a Halder (i.e., an Indian) and a Joseph (i.e., a Eurasian) implying thereby that in a court of law in British India, an Indian does not get justice as against a Eurasian.

At p 198, Apurva, another member of the Association, impatiently says—"A lie! Has nobody been ever sent to jail on a false complaint under the English rule? Why, the whole administration is founded on falsehood."

At p.211, Sumitra speaking of India, says in an incomplete sentence,—"In a country where the Government means the British merchant, and where this huge machinery has been set up for the purpose of sucking the blood of the whole country."

Throughout the book, the above sentiments are emphasised. Although taking the passages by themselves or in connection with the immediate context, it may appear that they are tirades against the arrogance of the English people, the evils of capitalism on the materialism of Western civilization, the real intention would be manifest from the vivid description of the distressed condition of the Indian people and the illdisguised attempt to distinguish the English people from the Government established by law in British India. I may refer to a few such passages.

At pp 81-82, there is a satirical account of the conquest of Burma and the subsequent administration established there. The implication in that passage is that such administration is solely for the benefit of English merchants at the cost of the people. The passages at pp. 213-216

ostensibly refer to European mill-owners. But taking the observation at p. 211 that the Government in this country means the British merchant, the indictment is really against the Government. At p. 243, the exhortation is really against the Government and not the English people at large, because the tragedy related there was brought about by the refusal of the magistrate to allow defensive arms to the helpless villagers. The same remark applies to the passages at pp. 244 and 301. The jeremiads appearing at pp. 323, 324, 326 and 328 may be put down as pure bolshevism and not sedition within the meaning of Sec 124A. The objectionable passages at pp 341-346 refer, to my mind, not only to European civilization, but to the Government as well, inasmuch as in this book, the Government is identified with the British merchant. Again, the passage at p. 415 refers to the system of administration in this country.

I have selected some passages only. The possible contention that the hero is preaching revolution in the sense of a quick and complete change from the Western system, as distinguished from subversion of Government does not seem to me to be well founded (See p. 363). Whatever subtle distinction may be drawn, there can be little doubt that the dominant intention in the book is to create hatred and discontent against the existing order of things. I am not unmindful of the fact that the precise method to be employed in bringing about the revolution is nowhere clearly indicated in the book. Nor am I unmindful of the fact that the story ends with the dissolution of the Association, implying that the country is not ripe for a revolution. Nevertheless the attempt to bring the Government into hatred is abundantly clear.

I think, therefore, that this book comes within the scope of sec 124A, I. P. C. to justify action under sec 99A Cr. P.C."

চীফ সেক্রেটারি, ১৯২৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর, লিখেছেন :

"The Advocate-General's opinion may be read.

The Government of Bengal in a letter in May 1925 in connection with Revolutionary Press Propaganda in Bengal declared its intention to prosecute (the press) 'without regard to the probable success of the case whenever it appears to him that a definite offence has been commited.' After perusing the letter I am satisfied that the Governor in council was then considering really only the daily press-periodicals. There is no such declaration about books. In the circumstances and in view of the Advocate-General's opinion I am inclined to proscribe this book "Pather Dabi" under Section 99A CPC and not start a prosecution under section 124A IPC. The success of a prosecution is to my mind open to question, not that I disagree with the Advocate General but because in a criminal case the court might give the accused the benefit of the doubt. In a case under section 99B, supposing the order under section 99A is objected to, the proceedings will be before a special Bench of three judges and no question of punishment of the author and the printer will arise and cloud the issue whether such a publication contains seditious matter."

ফাইলে আরও কিছু লেখালেখির পর বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট, ১৯২৭ সালের ৪ জানুআরি (নোটিফিকেশন নম্বর : ১০৩ পি), লিখেছে :

"In exercise of the power conferred by section 99A of the code of criminal procedure, 1898, as amended by the third schedule of the press Law Repeal and Amendment Act,

1922 (Act XIV of 1922), the Governor in council hereby declares to be forfeited to His Majesty all copies, wherever found, of the Bengali book entitled "Pather Dabi" written by Sri Sarat Chandra Chattopadhyay, printed by Sri Satya Kinkar Bandopadhyay at the Cotton Press, 57, Harison Road, Calcutta, and published by Sri Umapada (?) Mukhopadhyay, 77, Ashutosh Mukherji Road, Calcutta, on the ground that the said book contains words which bring or attempt to bring into hatred or contempt and excite or attempt to excite disaffection towards the Government established by law in British India, the publication of which is punishable under section 124A of the Indian Penal Code." (Political Department confidential file No. 605/26 of 1926)

নিষেধাজ্ঞার বিজ্ঞপ্তি 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৭ সালের ১৩ জানুআরি।

বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়, ১৯২৭ সালের ১৬ জানুআরি, চীফসেক্রেটারি প্রেন্টিস সাহেবকে লিখেছেন :

"I find that the book "Pather Dabi" by Sarat Chandra Chatterjee has been proscribed by Govt. Could you kindly let me have a copy of the book to enable me to read it and let me know which portions have been found objectionable. If possible, I should like to see the police report on the book, with Moberly's permission."

'পথের দাবী' পড়ে মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়, ১৯২৭ সালের ৬ ফেব্রুআরি, লিখেছেন :

"Many thanks. I have read the book "Pather Dabi" and I must confess that I am greatly disappointed in this production of its author who is a popular novelist. This book has hardly any literary or artistic merit. The author has

made no secret, or has failed in doing so in preaching the doctrines of (1) rank sedition, (2) revolutionary ideals, (3) Labour strikes, (4) hatred against the English people and Christianity, (5) Bolshevism and (6) disaffection against the Government. The Advocate General's criticisms are quite correct and its proscription is fully justified.

Apart from its political effect this book deals with matters that are idealistically quite repungnant to the traditions and sentiments of the Bengali people. To me it appears that the author has not been able to assimilate the teachings of Western culture which scientifically applied to the conditions prevailing in a certain section of the Bengali people could produce that situation in which a moral ideal could be set up by the exposure of the unreal and nefarious. In other words, his whole production is crude, and to be mild non-moral. The teachings are indefinite and lead to nowhere while the preachings are loud and vehement in respect of a social upheaval and therefore very dangerous.

The entire idea of the book is one of disruption and not of construction.

I have an idea that this story first appeared as a serial in a Bengali monthly journal, which I do not think, has been proscribed." (Political Department confidential file No. 605 K. W. of 1926)

'আত্মশক্তি', ১৯২৭ সালের ১৪ জানুআরি, লিখেছে :

"গত বুধবার সরকার এক ঘোষণাপত্রে জানাইয়াছেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত উপন্যাস "পথের দাবী" প্রচার আজ হইতে বন্ধ হইল এবং উহা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হইল। কারণ ঐ পুস্তক পাঠে ১২৪এ ধারায় বর্ণিত রাজদ্রোহ করিবার ইচ্ছা পাঠকের মনে জাগ্রত হইবার সম্ভাবনা আছে।

"পথের দাবী" তুই বৎসরের অধিককাল হইল "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তখন উহা পাঠে রাজদ্রোহ হইবার সম্ভাবনা হয় নাই। তারপর আজ প্রায় পাঁচ মাস হইল উপন্যাসখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে— এতদিন ত রাজদ্রোহের সম্ভাবনা হয় নাই; আজ হঠাৎ পৌষের শীতার্ত্ত, ঘন ঘটাচ্ছন্ন মলিন প্রভাতে চা পান করিতে করিতে ভারতে রাজদ্রোহ-সংরোধের একমাত্র কর্ত্তা শ্রীলশ্রীযুক্ত লাটসাহেব চিন্তা করিয়া দেখিলেন "পথের দাবী"তে রাজদ্রোহের বীজ রহিয়াছে! ৺বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত অহিফেন প্রসাদাৎ পৌষের প্রভাতে কেন, চৈত্রের নিশাশেষেও যদি এরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতেন তাহা হইলে আপত্তির কথা ছিল না। কিন্তু সপারিষদ লাট সাহেব গৌরচন্দ্র আজ তিন বৎসর পর বহাল তবিয়তে থাকিয়াও যদি এরূপ দিবাস্বপ্ন দেখেন এবং লজ্জার মাথা খাইয়া যদি তাহা গেজেটে প্রকাশিত করিয়াও থাকেন—তাহা হইলে যত না ভাবিত হইতে হয় গৌর-চন্দ্রের জন্য—তদপেক্ষা অধিক ভাবিতে হয় তাঁহার হস্ত পদ, কর্ণ চক্ষু সদৃশ গৌর-আমলক-কালমাণিকবর্ণচ্ছটাচ্ছন্ন তাঁহার কর্ম্মচারীদের জন্য। বৎসরের পর বৎসর যাহাদের রাজদ্রোহের বীজ অনুসন্ধান করিতে হয়রান হইতে হয় তাহাদের উপরই নির্ভর করে বাঙলার শাসন ও প্রজাপালন! নমঃ গৌরচন্দ্রায়!

শরৎচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন আমাদের এ পরাধীন দেশে সাহিত্যের সম্যক স্ফূর্ত্তিও প্রকাশ সম্ভব নহে। সরকারের হস্তে তাঁহার এই প্রথম পরাজয়ে—কিংবা বিজয়ে—আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দিত করিতেছি। তাঁহার লেখনী হইতে আরও দাবী প্রকাশিত হউক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।"

'ফরওয়ার্ড', ১৯২৭ সালের ১৪ জানুআরি, লিখেছে:

"A Notification has appeared in the current issue of the **Calcutta Gazette** to the effect that **Pather Dabi**—the latest novel from the pen of Sj. Sarat Chandra Chattopadhya—

'contains words which bring or attempt to bring into hatred or contempt and excite or attempt to excite disaffection towards the Government established by law in British India,' and on these grounds all copies of the book have been forfeited. The method and objective of thus putting a ban on an epoch-making book written by one of most thought-provoking literateurs of modern Bengal have something in common with the working of the infamous Ordinance. In exercise of the power conferred by that Act, the bureaucracy from time to time makes a swoop on the patriotic youth of Bengal. About 200 youngmen of Bengal have been thus spirited from their field of activity. On the report supplied by the abject, unscrupulous hirelings of the underworld of State, these people have been calumniated as 'outlaws' and 'conspirators' and have been shut up within prison-cells, though their countrymen have the highest opinion of their character and ability. In the case of the political prisoners, the Secret Service are found to be final judges and arbiters. The same deprave class of people were, we think, set up as the tribunal for judging the merits or demerits of one of the best works in Bengali literature.

....All despotic Governments having behind them no moral sanction and depending for their existence only on bayonets and bullets have taken recourse to such measures, namely, detention without trial of patriotic citizens, proscription of thought-provoking books, deportation of keen thinkers and great writers. But do these measures lead to any success? The despotic Czars of Russia transported to the wilds of Siberia innumerable students, writers and philosophers. The finest literary artist of Russia, we mean

Turgenev, ran imminent risk of being hanged for his association with the Nihilists. The pages of Dostoevski's novels reveal a bitter, agonising story of Czarist cruelties on innocent peasants and patriotic students and literary men. The Question presses itself upon all thinking men whether these despotic measures which the Government of Bengal are aping led to any success in Russia. It is now a matter of history how these tyrannical acts of successive Czars of Russia goaded a peace-loving, conservative peasantry into the vortex of blood-curdling revolution. The whole system with the Czars and Czarinas, princes and counts, blood-sucking capitalists and oppressive landlords collapsed like a house of cards at the very first onslaught of the Revolution. The Bourbon kings of France tried not a little to suppress the writings of the galaxy of poets and philosophers who preceded the French Revolution. But the revolution was ultimately hastened, instead of being averted, by the repressive measures adopted by the French monarchy and aristocracy. The Pope too when he found his authority dwindling in the Teutonic countries make a desperate attempt at recovering his supremacy by interdicting objectionable books and excommunicating undesirable persons. But he too despicably failed to avert the Protestant Revolution, and by his repressive methods turned a religious revolution into a most colossal political upheaval. The Stuart Kings of Britain fared no better, and Milton's "Areopagitica" remains the most indignant protest against unjust suppression of thought. The Government of India too may have to pay dearly if they continue in their mad career of repression and persecution.

Literature has been defined to be the most accurate of

mirror of national life. Judged from this standard, **Pather Dabi** is a unique production in our literature and its proscription will mean a heavy loss. One phase of our national struggle for freedom, we mean the revolutionary movement of Bengal, has found place only in this novel. As a work of art too, **Pather Dabi** will rank high among Bengali novels. The reading public of Bengal are likely to be sorely disappointed at the forfeiture of this masterly work from the pen of their most favourite author."

'পথের দাবী'র উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৭ সালের ১৪ জানুআরি, মন্তব্য করেছে। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সেই মন্তব্যের ইংরেজী অনুবাদ দপ্তরে রেখে দিয়েছে :

"We have nowhere found the bacilli of sedition lurking within the pages of this book. We want to know whether the Government consulted any expert in Bengali literature before they passed the order of proscription, or whether they relied merely on the report of the C. I. D. We hope our countrymen will not silently submit to this unjustifiable order of the Government." (Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the week ending 22 January 1927, p. 59)

'অমৃতবাজার পত্রিকা', ১৯২৭ সালের ১৫ জানুআরি, লিখেছে :

"So the master-piece of that Master-Novelist of present day Bengal—**Pather Dabi** by Sj. Sarat Chandra Chatterjee —has been proscribed. We are not surprised. This is just in keeping with the policy pursued by a soulless bureaucracy as a result of which about two hundred youths of Bengal are detained without trial.

The bureaucratic wisdom has discovered that Sarat Babu's book "contains words which bring or attempt to bring into

hatred or contempt and excite or attempt to excite disaffection towards the Government established by law in British India." If the book is so dangerous as that why does not the Government prosecute the author? Why did not the Government prosecute the conductors of **Bangabani,** a leading Bengalee magazine, in which the story appeared serially for months together? But the bureaucracy knows better. The bureaucratic distaste for open trials as strong as the owl's dislike for light.

Lord Lytton, the Hon'ble Messrs. Moberly and Donald may have to depend on translation to possess themselves of the contents of the book. But such is not the case with the two Bengalee executive councillors. Did they go through the book carefully before they wrote the fateful words "I agree"? But we forget the difference between brown bureaucracy and white is no more than between Tweedledum and Tweedledee."

'বেঙ্গলী', ১৯২৭ সালের ১৫ জানুআরি, লিখেছে :

"Our congratulations to Mr. Sarat Chandra Chatterjee, the renowned Novelist. The Government of Bengal have found it necessary to proscribe his "Pather Dabi". We do not know yet to what particular passages in the book the Government takes exception. But if the book were judged by its general trend, it did not deserve the honour conferred on it.

Already copies of the Novel have sold for three times its published price, as it was known in Calcutta for some time that it would be proscribed. Other publishers grew jealous of the signal distinction which, we had been told, was about to be thrust upon the well-known artist. But was all that really necessary?

'পথের দাবী'র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার অংশ

The true test by which a work of art should be judged is, what is the character of the sum total of the impression which it leaves upon the mind of the average reader? If the sum total of such impression is not positively harmful to public morals nor seriously injurious to the safety of the State, it should be left alone. If it is a good work of art, it will live. If otherwise, it will die a natural death. The rigorous application of the Censor's ban has served only to increase the sale of George Bernard Shaw's powerful play called "Mrs. Warren's Profession." Rabindra Nath Tagore's songs and poems which were judicially pronounced to be objectionable according to the standard laid down by the Indian Penal Code, were wisely let alone by Government and they have not had any increased circulation by reason of indiscreet proscription. Why could not the same policy be pursued in the case of Sarat Chandra Chatterjee, if, as we contend, the general trend of "Pather Dabi" is by no means harmful to society or injurious to the State?"

উত্তরকালে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "বাজেয়াপ্তির হুকুম বেরুল, কিন্তু একখানি মাত্র বই সরকারের হাতে গেল। আর সব বই-ই তখন অদৃশ্য হয়েছে। তার কারণ, ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদিনের মধ্যেই সব বই কলকাতা সহরের মধ্যে ও বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রেখে দেওয়া হয়, যাতে সন্ধানে এলেও সব বইগুলি পুলিসের হাতে না পড়ে। কয়দিনের ভিতর সব বইগুলি বিক্রীও হয়ে গেল। তাই আইনতঃ বই-এর প্রচার বন্ধ হোল। কিন্তু, ছাপা সব বই-ই তখন পাঠকদের হাতে। এদিকে বাঙলার বিপ্লবীদলের উৎসাহে ও উদ্যোগে অজ্ঞাত প্রেস থেকে নূতন সংস্করণ বার হয়ে বহু স্থানে বই ছড়িয়ে পড়ল। হাতে-লেখা সম্পূর্ণ বই-এর কপিও আমি দেখেছি। বাঙলার ঘরে ঘরে পথের দাবী পড়ার

বা এক কপি পথের দাবী কাছে পাওয়ার জন্যে সে কি আকুল আগ্রহ!”

ব্রাজেন্দ্রলাল আচার্য ‘পথের দাবী’র দীর্ঘ সমালোচনা করেছেন ‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’ পত্রিকায়—১৩৩৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে ও পৌষে। এই সমালোচনায় ‘পথের দাবী’ সম্পর্কে একটিও প্রশংসার অক্ষর নেই। ‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের মাঘে, লিখেছে: “পথের দাবী” পুস্তক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ায়, উহার সমালোচনার শেষাংশ প্রকাশিত হইল না।”

কেশবচন্দ্র গুপ্ত ‘পথের দাবী’র দীর্ঘ সমালোচনা করেছেন ‘অর্চ্চনা’ পত্রিকায়—১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে। সমালোচনাটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি:

“প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রের “পথের দাবী” সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। এক কলমের খোঁচায় কোনও সাহিত্যিক দার্শনিক বা কবির স্বাধীন চিন্তাকে সীমাবদ্ধ করিবার অধিকার বহুদিন সরকার এদেশে নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং যে কোনও সন্দর্ভ বাজে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিবার ক্ষমতা এখন আইন-মূলক রাজশক্তির অন্তর্ভূত। যাঁদের হাতে এই রাজ অধিকার ন্যস্ত, তাঁদের বুদ্ধিমত্তা, বিচার-ক্ষমতা ও কল্পনার সাহিত্যিকের কল্পনা মুখাপেক্ষী। ইহার অনিবার্য্য ফলে হয় এক পক্ষের কল্পনা শৃঙ্খলাবদ্ধ—অপর পক্ষের কল্পনা উদ্দাম ও অসীম।

শরৎচন্দ্র বাঙ্গালার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। কথাসাহিত্যের তিনি “রথী” বলিয়া বর্ণিত হন। তাঁহার বর্ণনার ভঙ্গীতে বিশেষত্ব আছে। কাজেই তাঁহার পাকা হাতের লেখা পড়িবার জন্য বাঙ্গালী পাঠকের এত আগ্রহ। তাঁহার নিগ্রহের কথা তাই সকল কণ্ঠে এবং এই নিগ্রহ শরৎচন্দ্রকে আরও জনপ্রিয় করিয়াছে।

সাহিত্যের দিক হইতে ধীরভাবে দেখিলে আমার মনে হয় যে “পথের দাবী” লোপ পাইয়া শরৎচন্দ্রকে রাহুমুক্ত করিয়াছে।

কারণ, এই পুস্তকের লেখক যদি "রথী" শরৎচন্দ্র না হইতেন, লোকে পথের দাবীকে উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস বলিত না।....

গল্পের নায়ক সব্যসাচী—অতি-মানুষ। সে অতি-মানবতার নিদর্শন তাহার ব্যবহারে, কথায়, মতে বা ইমোসানে কিছু নাই।.... তাহার ব্যবহারে লেখক দেখাইয়াছেন তাহাকে একটা বে-আক্কেলী ভূতুড়ে জীব, যাহার প্রবৃত্তির মূলে কোনও উচ্চতা নাই, কোনও জাতি-প্রিয়তা, দেশপ্রিয়তা বা গভীর সুকোমল বৃত্তি নাই—চরিত্রের অন্তস্তলে আছে কেবল হিংসা—ইংরাজের উপর দারুণ পৈশাচিক হিংসা, এত বড় অতি-মানবের হিংসার কারণও অদ্ভুদ্। দেশের জন্য, দশের জন্য, স্বজাতির উদ্ধারের জন্য সব্যসাচী ইংরাজদ্রোহী নয়। তাহার এত গভীর ইংরাজদ্বেষের কারণ বিচিত্র। কোন্ জেলার কোন্ হাকিম তাহার দাদাকে একটা বন্দুকের পাশ দেয় নাই। তাহার দাদা ডাকাতের হস্তে দেহত্যাগ করিয়াছিল। এই ভীষণ অন্যায়ের জন্য সে স্থানে স্থানে বিষ-উদ্গার করিয়াছে। সে বিষ অপর কিছু না, হাটে বাজারে বক্তারা যে ভাষায় সরকারের নিন্দা করে, সেই বিষগুলা একত্র সংগৃহীত হইয়া কয়েকটা পৃষ্ঠায় সরস শারদ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রবীণ পাঠক সব্যসাচীর চরিত্রের সঙ্গে সে কথাগুলা লইলে প্রলাপ ভিন্ন অপর কিছু মনে করিবে না। সরকারের বোধ হয় এই জমাটি গালাগালিতে আসন টলিয়াছে। ছেলে ছোকরার মাথা বিগড়াইবার ভয়েই বোধ হয় বাঙ্গালার আমলাতন্ত্র পুস্তকখানিকে বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। আমার মনে হয়, এই পাতা কয়খানাকে "বিষ" বলিয়া লেবেল মারিয়া বর্জ্জন করিলে তাঁহাদের কার্য্য সিদ্ধ হইত। বাকি যাহা থাকিত, তাহাতে পাঠক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দের উত্তেজক ডিটেকটিভ গল্পের রসোপভোগ করিত। ছায়াচিত্রে দেখাইলে ম্যাডেন কোম্পানীও মার্ মার্ কাট্ কাট্ শ্রেণীর একটি নূতন পালা দেখাইতে পারিত।....

"পথের দাবী" পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, সুতরাং বহুদিন

পূর্ব্বের পড়া পুস্তক সম্বন্ধে স্মৃতি হইতে দুই চারিটা কথা বলিলাম। আমি সরকারের সুখ্যাতি করিতেছি না। কিন্তু আমার আপশোষ যে, শরৎবাবুর পাকা হাতে এমন গল্প বাহির হইল।...."

'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ও 'অর্চ্চনা'য় প্রকাশিত 'পথের দাবী'র দুটি দীর্ঘ সমালোচনার ইংরেজী সারানুবাদ বিটিশ গবর্নমেণ্ট গোপন ফাইলে রেখে দিয়েছে। (Political Department confidential file No. 146/27 of 1927)

'কল্লোল', ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের মাঘে, লিখেছে: "এতকাল পরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "পথের দাবী" উপন্যাসখানি সত্যই বাজেয়াপ্ত হইল। গত বুধবারের (১২ই জানুয়ারী, ১৯২৭) Extra Ordinary গেজেটে উহা বাজেয়াপ্ত হইল বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। বাংলাদেশের একখানা উপন্যাসকেও শেষকালে খাস-দখলে টানিতে হইল! বাংলা সাহিত্যের পরম ক্ষতি যে একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এরূপে বন্ধ হইয়া গেল।"

'মডার্ন রিভিউ,' ১৯২৭ সালের ফেব্রুআরিতে, লিখেছে:

"A novel named "Pather Dabi", or ' The Path's Demand" by Babu Sarat Chanda Chatterjee, has been proscribed by the Government of Bengal, and copies of it, wherever found, would be confiscated. Babu Sarat Chandra is a leading novelist of Bengal. This particular work of his appeared serially for a long time in a Bengali monthly published from the residence of the late High Court Judge Sir Ashutosh Mukherjee by one of his sons, who is a High Court Vakeel and Fellow and member of the Syndicate of the Calcutta University. The Government said nothing so long as it appeared serially, but now it has found something very seditious in it, though what that is the public has not been told.

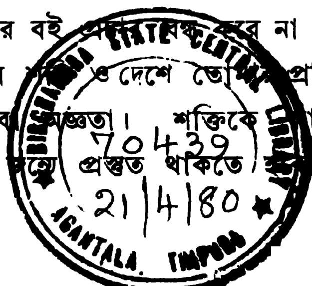
It will help our readers to understand the position of Babu Sarat Chandra as an author if we tell them that at Villeneuve, Switzerland, M. Romain Rolland told us in the course of our conversation with him that he had read the Italian translation of the English translation of Sarat Chandra's **Srikanta,** and he observed that the author was a novelist of the first order. As M. Rolland does not read or speak English, he had to form his judgment of Sarat Chandra's quality as a novelist from a translation of a translation ; yet that was his opinion. But some underling of Bengal Government has scented sedition in one of Sarat Chandra's works and so it is a book dangerous to society ! Or is it to the bureaucracy ?"

শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা যে সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যেন প্রতিবাদ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৭ সালের ১০ ফেব্রুআরি, শরৎচন্দ্রকে লিখেছেন :

"তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্ত্তব্য হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কেন না লেখক যদি ইংরেজ-রাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজ-রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ-রাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলেম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখ্‌লেম একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্ণমেণ্টই এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব

সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনামাত্র—তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্ত্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজ রাজের কাছেই দাবী করি নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পুজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোনো শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখ্‌লে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হ'ত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চল্‌বে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে সেখানে এমনিই ঘটেচে—রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেচে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখ্‌তে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চল্‌তেই থাকবে—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালকবালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্য্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকিতে হয় এই



কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।”*

শরৎচন্দ্র, ১৯২৭ সালের ১৪ ফেব্রুআরি, রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন ঃ

“আপনার পত্র পেলাম। বেশ তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা, কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্ত্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমানও নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা' আছে সে সম্বন্ধে আমার দুই একটা প্রশ্নও আছে বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরাজ রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠ্‌বারই কথা। কিন্তু এ যদি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম তাহলে লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ, তা আমি করিনি। করলে politicianদের propaganda হ'ত, কিন্তু বই হ'ত না। নানা কারণে বাঙ্‌লা ভাষায় এ ধরণের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্ব্বত্রই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা বিচারের ভান ক'রে কয়েদ নির্ব্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমিই যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই।

* রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র, ১৯২৭ সালের ১০ অক্টোবর, লিখেছেন : “এ চিঠি' তিনি ছাপাবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্যে যে কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেটসম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেচে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে।...”

তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং, দুদিন আগে পাছের জন্যে কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক্। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় ত কর্‌তেই হবে,—তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে, এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে, গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয় তখন, দুবছর না হয়ে তিন বছর হল কেন এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজ-বন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ ছানা মাখন পায় না ব'লে কিম্বা, মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্চে, আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাই না কেন এই বলে চিঠি লিখে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি Jail authorityরা ঘাসের ব্যবস্থা করে তখন, হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্য্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা' উচিত বলে মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরেজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গবরমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। এ কথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু ও আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করবার justification যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে protest করার justificationও তেম্‌নি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে নিজে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা না। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশি আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে এই বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোতো। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখিনি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্চি, তাই সমস্ত ছেড়েছুড়ে নির্ব্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থ্যে সময়ে কত যে গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞাতাবশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন; সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে।”

চিঠিখানা লিখলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে পাঠালেন না। শরৎচন্দ্র, ১৯২৭ সালের ১৮ ফেব্রুআরি, উমাপ্রসাদকে লিখেছেন : "শ্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি পেয়েছি। তাঁর অভিমত মোটের উপর এই যে, বইখানি পড়লে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে স্বদেশে বিদেশে যত রাজশক্তি আছে ইংরাজের মত ক্ষমাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা। অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল এ বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।"

তারপরেই উমাপ্রসাদ সামতাবেড়ে গেলেন। উত্তরকালে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "গিয়ে দেখি, শরৎচন্দ্র বিশেষ উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ। তিনি ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটা উত্তরও লিখে রেখেছেন ; কিন্তু পাঠান নি। জবাবটি পাঠানো উচিত হবে কিনা সে-বিষয়ে আমাদের কথা হয়। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে মানতেন, তাঁকে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি কোরতেন। রবীন্দ্রনাথও অকৃপণ ভাষায় শরৎচন্দ্রের শক্তির ভূয়সী প্রশংসা কোরতেন। তবুও, অনেক বিষয়েই তাঁদের মধ্যে মতের অনৈক্য ছিল।"

'পথের দাবী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানা শরৎচন্দ্রের কাছে দুঃসহ। শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদকে বললেন—দেখো, বারবার আমি এ-চিঠিখানি পড়ছি, আর ভাবছি, রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও আমাকে লিখতে পারলেন!

রবীন্দ্রনাথের চিঠি ও শরৎচন্দ্রের উত্তর—দুখানাই উমাপ্রসাদ কলকাতায় নিয়ে গেলেন। উত্তরটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হবে কিনা, কথা হয়ে রইল, দুদিন পরে শরৎচন্দ্র যখন কলকাতায় যাবেন তখন উমাপ্রসাদকে সে-বিষয়ে জানাবেন।

দুদিন পর শরৎচন্দ্র কলকাতা এলেন। তখন অনেকটা শান্ত

হয়েছেন। উমাপ্রসাদকে বললেন—নাঃ। আর বাদানুবাদের মধ্যে নয়। ও আমার ভালো লাগে না। কবির এ-চিঠির প্রচার হওয়াও ঠিক নয়। আমার চিঠিও পাঠিয়ে দরকার নেই। এ-চিঠি দুখানি তোমারই কাছে থাক। কিন্তু কাউকে তুমি এগুলি দেখিও না—বিশেষত যতদিন রবীন্দ্রনাথ ও আমি আছি। এ-চিঠির বিষয় নিয়ে কারো সঙ্গে অলোচনাও কোরো না।

'পথের দাবী' সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের উত্তরটি কখনও রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয় নি। (উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়: শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষ', কার্তিক, ১৩৬০, পৃ. ৪৭০-৭৬)

'পথের দাবী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানা শরৎচন্দ্রের মর্মস্থলে বিদ্ধ হয়ে থেকেছে। শরৎচন্দ্র, ১৯২৭ সালের ২৭ অগস্ট, উমাপ্রসাদকে লিখেছেন: "রবিবাবুর সে চিঠি আমি ভুলতে পারি নি, কোনদিন পারবো বলেও ভরসা হয় না।"

হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১৯২৭ সালের ২৩ অগস্ট, কাউন্সিলে প্রশ্ন করেছেন:

"(a) Will the Hon'ble Member in charge of the Political Department be pleased to state whether any legal opinion was consulted before issuing the Notification No. 103P, dated the 4th January, 1927, forfeiting all copies of the Bengali Novel "Pather Dabi" written by Srijut Sarat Chandra Chattopadyaya ?

(b) If so, whose opinion was consulted ?

(c) Will the Hon'ble Member be pleased to state whether the Advocate-General is consulted in such cases ?

(d) If the answer to (c) is in the negative, what are the reasons therefor ?"

কাউন্সিলের সদস্য মোবার্লী সাহেব তখন রাজনৈতিক দপ্তরের প্রধানতম রাজকর্মচারী। তিনি উত্তর দিয়েছেন:

"(a) Yes.

(b), (c), (d) Government are not prepared to give this information." (Bengal Legislative Council Proceedings, Twenty-Sixth Session, 1927, pp. 27-28)

সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯২৭ সালের ২৫ অগস্ট, কাউন্সিলে প্রশ্ন করেছেন :

"(a) Will the Hon'ble Member in charge of the Political Department be pleased to state why the novel "Pather Dabi" of Sj. Sarat Chandra Chatterji has been proscribed ?

(b) Are the Government prepared to withdraw the order ?

(c) If the answer to (b) is in the negative, are the Government prepared to refer the book for opinion to a Board of Litterateurs of international fame ?"

মোবার্লী সাহেব উত্তর দিয়েছেন :

"(a) Because it appeared to Government to contain seditious matter.

(b) No.

(c) No." (Bengal Legislative Council Proceedings, Twenty-Sixth Session, 1927, p.211)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের চৈত্রে, 'প্রবাসী'তে লিখেছেন :

"সুরমা সাহিত্য সম্মেলনে আমাকে এ বৎসর সভাপতির কাজ করিতে হইয়াছিল। বাংলা গভর্মেণ্ট যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "পথের দাবী" বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব সম্মেলনের বিষয় নির্ব্বাচন কমিটিতে উপস্থিত করা হয় এবং তর্কবিতর্কের পর প্রস্তাবকেরা তাহা প্রত্যাহার করেন ; আমি এইরূপ অবগত হই। পরে দশজন প্রতিনিধি সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় উহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত একটি আবেদন করেন। এ বিষয়ে আমি যাহা সিদ্ধান্ত করি, তাহার বিরুদ্ধে এবং আমার

"অদ্ভুত মনোবৃত্তির" বিরুদ্ধে একটি চিঠি দুখানি বাংলা দৈনিক কাগজে দেখিলাম। আমি যে-যে কারণে প্রস্তাবটি সম্মেলনের নিকট উপস্থিত করিতে দি নাই, তাহা বলিতেছি। সম্মেলনটি সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নহে। নানা রাজনৈতিক মতের লোক ইহার সভ্য; সরকারী কর্ম্মচারীরাও ইহার সভ্য। রাজনৈতিক বিষয় সাহিত্যিক সম্মেলনে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, আলোচ্য সাহিত্যিক বিষয়ের অভাব নাই, বরং খুব প্রাচুর্য্যই আছে। সাহিত্যিক সম্মেলনে রাজনীতি ঢুকাইলে তাহা হইতে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে পরোক্ষভাবে কার্য্যতঃ তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে লাভ নাই, ক্ষতি আছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া, সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া, গভর্ম্মেণ্টের কর্ম্মচারীরাও যদি রাজনৈতিক কর্ম্মীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া দেশের এক রকম সেবা করিবার সুযোগ পান, তাহাতে উপকার বই অপকার নাই; বঙ্কিমবাবুর নাম উল্লেখও আমি করিয়াছিলাম।

আমি এইরূপ নানা কারণে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইতে দি নাই। শরৎবাবুর বহিটি সম্বন্ধে আমার কথা বিকৃত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যতদূর মনে পড়িতেছে, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই:—"ধারাবাহিক রূপে যখন শরৎবাবুর বহি একখানি মাসিকে বাহির হয়, তখন উহা পড়িবার অবসর আমার হয় নাই—বস্তুতঃ সে প্রকারে প্রকাশিত কম জিনিষেরই পাঠ আমার ভাগ্যে ঘটে। যখন উহা পুস্তকাকারে বাহির হয়, তখন উহা আমার হস্তগত না হওয়ায় উহা দেখিতে পাই নাই। সুতরাং ঐ বহিটি সম্বন্ধে আমি কোন মত প্রকাশ করিতেছি না, করিতে পারি না।"

যে কোন কারণেই হউক, গভর্ম্মেণ্ট কর্ত্তৃক সরকারি কোন পুস্তক বাজেয়াপ্ত করার আমি যে বিরোধী তাহা বুঝাইবার জন্য আমার অভিভাষণের নিম্নমুদ্রিত শেষ বাক্যটির প্রতি আমি সভার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম:—

"পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সাহিত্য মানুষের অন্তরের পূর্ণ বাহ্য প্রকাশ বলিয়া, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে পূর্ণ আত্ম-প্রকাশের স্বাধীনতার উপর সাহিত্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে।"

তাহা করিয়া আমি নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলাম, ইংরেজীতে একটি লাটিন প্রবাদ-বাক্য verbum sap এইরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে চলিত আছে তাহার মানে, বিজ্ঞদের কাছে একটা শব্দ, একটা সঙ্কেতই যথেষ্ট। আমার শ্রোতাদের বুদ্ধিমত্তার উপর আমার শ্রদ্ধা থাকায় আমি আমার অভিভাষণের এই শেষ বাক্যটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করি নাই। ঐ বাক্যটি হইতেই সভাস্থ ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়েরা পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ করা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার মত বুঝিতে পারিবেন।"

কেহ যদি বলেন, যে, তাঁহার বুদ্ধিমত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমার মূঢ়তার ও "অদ্ভুত মনোবৃত্তির" পরিচায়ক, তাহা হইলে আমি সে দোষ স্বীকার করিতেছি।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিতে দেখিলাম, "ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ বাহির হইয়া চলিয়া যাইবেন।" ইহা এই প্রথম জানিলাম। শিলচরে এইরূপ কিছু শুনি নাই। কথাটি সত্য কি না, বলিতে পারি না।

যে-প্রস্তাব সভায় করিতে দেওয়া হইবে না, তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে দিবার রীতি কোথাও চলিত আছে বলিয়া আমি অবগত নহি। এই জন্য শ্রীযুক্ত অনিলকুমার রায়কে বক্তৃতা করিতে দি নাই। কিন্তু তাঁহাকে বক্তৃতা না করিতে অনুরোধ বিনীত ও শিষ্ট ভাষায় করিয়াছিলাম; আমার মুখে যে কথা দেওয়া হইয়াছে, সেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়িতেছে না।

আমার বিবেচনায় সুরমা সাহিত্য সম্মেলনে "আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রতি" বিন্দুমাত্রও "অবমাননা" হয় নাই।

"রামানন্দবাবুর অদ্ভুত আচরণ" প্রভৃতি শিরোনাম দিয়া চিঠি

লিখিলে চটক্‌দার লেখা হয় বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তির "অনস্তুত" আচরণেরও কোন কোন দৃষ্টান্ত বোধ হয় "সংবাদদাতা" লিখিতে পারিতেন। "সংবাদদাতার" তাহা কি কর্ত্তব্য নহে? আমার মতে সংবাদ দেওয়া সংবাদদাতার মুখ্য কাজ, সমালোচনা গৌণ কাজ।

পরিশেষে বক্তব্য, সম্মেলন প্রভৃতির উদ্যোক্তাগণ সত্বর এক একটি কার্য্যবিবরণ খবরের কাগজে আগেই পাঠাইয়া দিলে পাঠকদের সত্যনির্দ্ধারণের সুবিধা হয়।"

'শনিবারের চিঠি', ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের চৈত্রে, মন্তব্য করেছে:

"স্বরাজ্যদল কর্তৃক পরিচালিত একটি বাঙলা দৈনিক পত্র ন্যায় ও সত্য প্রচারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।...

সুরমা সাহিত্য সম্মিলনে শরৎবাবুর 'পথের দাবী' লইয়া যে আলোচনা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে শুধু বিকৃত রিপোর্ট দেওয়া নয়, সম্পাদকীয় স্তম্ভে সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া ইঁহারা ন্যায়-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। দেশপ্রেম with a vengeance ইহাকেই বলে।

কিন্তু এই মহাপুরুষেরা যদি 'নির্ব্বুদ্ধিতা ও সঙ্কীর্ণতা' বিসর্জ্জন দিয়া একটু তাকাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের আর এই হাস্যকর অভিনয়টি করিতে হইত না। কিন্তু তাকাইয়া দেখা বুঝি ইহাদের স্বভাব নহে। যে কোন বস্তু বা ব্যক্তির উপর নিজেদের স্বকপোলকল্পিত মনোভাব আরোপ করিবার জন্য ইঁহারা এতই ব্যস্ত যে অত্যন্ত প্রকট সত্যকেও ধামাচাপা দিতে কুণ্ঠিত নন।

সুরমাতে যে সম্মিলন হইয়াছিল তাহা সাহিত্যিক সম্মিলন; সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির আংশিক যোগ থাকিলেও রাজনীতি সাহিত্য নয়। রাজনীতিবিষয়ক আলোচনা করিবার ক্ষেত্র সাহিত্য সম্মিলন নহে। সেজন্য রাজনৈতিক সম্মেলনের আবশ্যক।....

স্বরমা সাহিত্য সম্মিলনও রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ডাকা হয় নাই। সাহিত্য ও সেই সম্পর্কে যতটুকু রাজনীতি সামাজিক নীতি বা অর্থনীতি আসিয়া পড়ে ততটুকুই এখানে আলোচিত হইয়াছিল। সম্মিলনীতে যদি 'পথের দাবী'র বিষয়-বস্তু লইয়া আলোচনা উঠিত এবং সভাপতি মহাশয় সে আলোচনায় বাধা দিতেন, তাহা হইলে অন্যায় হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা উঠিয়াছিল 'পথের দাবী'র বাজেয়াপ্তি করা লইয়া। গবর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক কারণেই এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের প্রতিবাদ সাহিত্য-সভায় হইতে পারে না। সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি সভাপতির নিকট প্রস্তাবটি পেশ হইবার পূর্ব্বেই এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের নিকট পুনর্ব্বার তাহা পেশ করা হইলে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন যে, যেহেতু ইহা সাহিত্য-সম্মিলন এবং যেহেতু বহু গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছে, এই প্রস্তাব আলোচিত হইলে গবর্ণমেণ্টের বিধি অনুযায়ী তাঁহারা ইহাতে যোগ দিতে পারিবেন না, সেই হেতু তিনি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে যদি তিনি আজও জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে এই প্রস্তাবে তিনিও আইনতঃ যোগ দিতে পারিতেন না।....

উক্ত সংবাদ পত্রে এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে 'পথের দাবী' পুস্তকটি সম্বন্ধেই তাঁহার আপত্তি ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। এই অপবাদ যে কতদূর জঘন্য তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। 'পথের দাবী' আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। তিনি এই পুস্তক পড়িবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু পুস্তক প্রকাশক তাঁহাকে এই পুস্তক যোগাড় করিয়া দিতে পারেন নাই। শরৎবাবুও এ কথা অবগত আছেন। সুতরাং এ পুস্তকের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে তাঁহার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

তুমি যদি [illegible]
[illegible]
কিন্তু আমাদের [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] আমার [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] এই [illegible]
[illegible] এই [illegible]
[illegible]
[illegible]

জানা নাই। তবুও তিনি, এই পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইবার পর প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ উভয় পত্রিকাতেই গবর্ণমেন্টের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং সেই প্রসঙ্গে শরৎবাবুর কোনো উপন্যাস সম্বন্ধে রোমাঁ্যা রলাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথা প্রকাশ করেন। যদি শরৎবাবু সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধা না থাকিত তাহা হইলে এই সংবাদ তিনি প্রকাশ না করিতেও পারিতেন। কারণ এই প্রশংসা রলাঁ মহোদয় প্রবাসী সম্পাদকের সহিত ব্যক্তিগত আলোচনার মধ্যে করিয়াছিলেন। এই সংবাদ তিনি ছাড়া আর কাহারও জানা সম্ভব ছিল না। এতদ্‌ব্যতীত, শরৎবাবু সম্বন্ধে মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় Notes বিভাগে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাও উল্লেখযোগ্য; শরৎবাবুর 'বিন্দুর ছেলে'র অনুবাদ Modern Review-এ বাহির হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় 'পথের দাবী' পুস্তকখানিকে রাজনৈতিক আখ্যা দিয়া তাহার সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করিয়াছেন ইহা একেবারেই সত্য নহে। 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারটা লইয়া আলোচনা তিনি সাহিত্যসভায় উঠিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। ইহার মধ্যে যাঁহারা তাঁহার 'সঙ্কীর্ণতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা' দেখিয়াছেন এবং 'আন্তরিকতায় সন্দেহ' করিয়াছেন তাঁহারা নির্ব্বুদ্ধিতা ও সঙ্কীর্ণতার কোন স্তরে নামিয়াছেন বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।..."

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে 'প্রবাসী'তে লিখেছেন: "কয়েক দিন হইল, আমার বয়স আরও এক বৎসর বাড়িয়াছে এবং আমি মৃত্যুর দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়াছি। আমার জীবনের নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বদিন জীবনের অতীত কালের নানা ঘটনা ও অবস্থার কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ শিলচরে সুরমা সাহিত্য-সম্মিলনীতে যে রাজনৈতিক প্রস্তাবটি আলোচিত হইতে দি নাই, তাহার বিষয় মনে পড়িল।

মনে হইল, সাহিত্যবিষয়ক সভাতে রাজনৈতিক কোন প্রস্তাবের আলোচনা সাধারণতঃ অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক বটে, কিন্তু রাজনীতি যদি সাহিত্যকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ করিবার অধিকার সাহিত্যের অবশ্যই থাকা উচিত। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' রাজনৈতিক বহি বটে কি না, জানি না, তাহার আলোচনারও প্রয়োজন নাই; কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক উহা রাজনৈতিক কারণেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এবং বিনা প্রকাশ্য বিচারে উহা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। সাহিত্যের উপর গবর্ন্মেণ্টের এই অবিচারিত আক্রমণের প্রতিবাদ সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে হওয়া সঙ্গত। আমি যখন সুরমা সাহিত্য-সম্মিলনীতে প্রতিবাদটি আলোচিত হইতে দি নাই, তখন এই যুক্তি আমার মনে উদিত হয় নাই; সাহিত্যসভায় রাজনৈতিক প্রস্তাবের আলোচনা হওয়া অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক, এই সাধারণ নীতি অনুসারেই আমি প্রশ্নটির মীমাংসা করিয়াছিলাম। এখন যে যুক্তির উল্লেখ করিলাম, তখন তাহা মনে আসিলে এই মীমাংসা করিতাম, যে, প্রতিবাদটির আলোচনা সম্মিলনীর সভায় হইতে পারিবে, আলোচনা বা ভোটপ্রদানের সময় সরকারী কর্ম্মচারীরা ইচ্ছা করিলে সভা হইতে অনুপস্থিত থাকিতে বা ভোট না দিতে পারেন। এখন আমি যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে আমার ভ্রম হইয়াছিল মনে হইতেছে। তাহার প্রতিকার করিবার সাধ্য এখন আমার নাই কিন্তু কর্ত্তব্য বোধে আমার বর্ত্তমান মত প্রকাশ করিলাম।"

'বাঙ্গলার কথা', ১৯২৮ সালের ২১ জুন, মন্তব্য করেছে: "কয়েকদিন হইল প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের আরও এক বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তিনি "জীবনের অতীতকালের নানা ঘটনা ও অবস্থার কথা" ভাবিতেছিলেন, "এমন সময় হঠাৎ শিলচর সুরমা সাহিত্য সম্মিলনীতে যে রাজনৈতিক প্রস্তাবটী আলোচিত হইতে" দেন নাই, "তাহার বিষয় মনে পড়িল।" তারপর তাঁহার মনে যে সকল বিচার,

বিবেচনা ও যুক্তির অবতারণা হইল, তাহার মোটকথা হইল এই যে "রাজনীতি যদি সাহিত্যকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ করিবার অধিকার সাহিত্যের অবশ্যই থাকা উচিত।" এই নির্দ্ধারণে উপনীত হইতে প্রবাসীর প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়কে "জীবনের নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বদিন জীবনের অতীতকালের নানা ঘটনা ও অবস্থার কথা ভাবিয়া" প্রবাসীতে একখানা "সম্পাদকের চিঠি" লিখিতে হইয়াছে! যাহা হউক, সব ভাল যার শেষ ভাল। এত গোলমাল, বাক্‌বিতণ্ডা ও কলহের পরও যে তাঁহার মনে "সঙ্গত" যুক্তিটার কথা মনে হইয়াছে, তাহাও সুলক্ষণ বলিতে হইবে! আমাদের শুধু এই কামনা—তাঁহার জীবনে শুধু "নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বদিন" নয়, আরম্ভ হইবার পরও যেন মাঝে মাঝে মনের মধ্যে "সঙ্গত" যুক্তির উদয় হয়; তাহা হইলে অকারণ মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।"

বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট, ১৯২৬-২৭ সালের প্রশাসন সম্পর্কিত রিপোর্টে, লিখেছে:

"The most popular novelist, Babu Sarat Chandra Chatterjee, found a new vent for his morbid sentimentalism in a bitterly virulent attack on the alleged land-grabbing propensities of the European powers and the suspected political aims of the various Christian missions in Asia." (Report on the Administration of Bengal, 1926-27, p. 249).

'ফরওয়ার্ড', ১৯২৮ সালের ৭ জুলাই, লিখেছে:

"The most popular novelist, Babu Sarat Chandra Chatterjee" states the Bengal Administration Report for the year 1926-27, "found a new vent to his morbid sentimentalism in a bitterly virulent attack on the alleged land-grabbing propensities of the European Powers and the suspected political aims of the various Christian missions in

India." The reference is obviously to Sj. Chatterjee's remarkable novel "Pather Dabi" which as soon as it saw the light was proscribed. This gem of literary criticism which we cull from the Administration Report has left us gaping with wonder. The word 'alleged' prefixed to the land-grabbing propensities of the European Powers has caused us no less wonder. Has the official chronicler any doubts as to land-grabbing propensities of the European Powers ? Africa has been parcelled up into slices and the whole of India has been marked red. China also has only just freed herself from the tentacles of European Powers. How could the official chronicle overlook so many hard facts ?"

'মডার্ন রিভিউ', ১৯২৮ সালের অগস্টে লিখেছেন :

"The Bengal Administration Report for 1926-27 has the following on Babu Sarat Chandra Chatterjee :

> The most popular novelist, Babu Sarat Chandra Chatterjee, found a new vent for his morbid sentimentalism in a bitterly virulent attack on the alleged land-grabbing propensities of the European powers and the suspected political aims of the various Christian Missions in Aisa.

That "alleged " is exquisite !

Perhaps the writer of the Report suspected that Great Britain might be included among the European powers. But who does not know that the inhabitants of that island have never been guilty in their history of land-grabbing ?

In the year 1866 Messrs William Blackwood and Sons of Edinburgh and London published a book entitled "The Company and the Crown" by the Hon'ble T.J. Hovell-Thurlow. This author was not a little Englander. For he wrote in his book with reference to the Punjab :

> Such a country, so inhabited, surely was a worthy object of ambition for a man who seemed to have adopted as a rule of guidance the elementary doctrine of the fifteenth century, "that the heathen nations of the world were lawful spoil and prey," and that the right of native Indians was subordinate to that of the first Christian conqueror, whose paramount claim excluded that of every other civilised nation, and gradully extinguished that of the natives.

This proves that the Hon'ble T. J. Hovell-Thurlow was an imperialist. Nevertheless the following paragraph relating to **earth-hunger** is to be found in his book :

> A recent writer has informed us that "there is a malady common to savages in certain parts of the world termed 'earth-hunger'. It provokes an incessant craving for clay, a species of food that fails to satisfy the apetite and impairs the power of digestion." The East India Company suffered from this dire disorder for upwards of a century ; and since it has been deemed that the excesses recorded in this chapter were those which ultimately proved fatal to its life, it is to be sincerely prayed for that the Crown, wiser than its predecessor, may, in the words of the writer above quoted, "now cease to make nobles landless" and to increase the sum of Asiatic misery.

Subsequent history shows that the British Crown has not been less earth-hungry than the East India Company."

'প্রবাসী',—১৩৩৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে, মন্তব্য করেছে : "ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের অন্য জাতির ভূমি দখল করিবার প্রবৃত্তি

অতি সত্য কথা, ইহা মিথ্যা আরোপিত ("alleged") দোষ নহে। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। তদ্ভিন্ন, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ বলিতে শুধু ইংরেজ জাতিকে বুঝায় না। অন্য ইউরোপীয় জাতির দোষ ক্ষালনে আলোচ্য রিপোর্টে এত উৎসাহ কেন প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা একটি বাংলা প্রবাদ বাক্য হইতে অনুমিত হইতে পারে। খৃষ্টিয়ান মিশন সম্বন্ধে শরৎবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তিনি প্রথমে বলেন নাই; বাইবেল, বোতল ও ব্যাটালিয়নের পরে পরে আবির্ভাব সম্বন্ধে ইংরেজীতেই উক্তি আছে।"

শরৎচন্দ্রের সভাপতিত্বে, ১৯২৯ সালের ১৬ মার্চ, মেদিনীপুর সাধারণ পাঠাগারের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। 'বাঙ্গলার কথা', ১৯২৯ সালের ১৭ মার্চ, লিখেছেঃ "সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতায় দেশের বর্ত্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা আলোচনা করিয়া বলেন যে আধুনিক সাহিত্যে ইহাদের স্থান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তিনি এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে এখন অনেকে নির্ভীকভাবে মত প্রকাশ করেন সত্য কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে সেইরূপ নির্ভীকতা দেখা যায় না। তিনি এই বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন যে বড় সাহিত্যিক বড় জাতির অগ্রদূত স্বরূপ।"

'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হওয়ার তিন বছর বাদে শরৎচন্দ্র লাহোরে একটি সভায় বলেছেনঃ "একটা বই লিখলুম 'পথের দাবী' সরকার বাজেয়াপ্ত করে দিলে। তার সাহিত্যিক মূল্য কি আছে না-আছে দেখলে না। কোথায় গোটা দুই সত্য লিখেছিলুম, সেইটাই দেখলে।"

সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে ঃ

"The receipt of the book entitled "Pather Dabi" by Sarat Chandra Chatarji, from the Deputy Inspector-General of Police, Criminal Investigation Department, Intelligence

Branch, Bengal, to whom it was sent on requistion in connection with a case under section 36 of the Bengal Suppression of Terrorist Outrages Act, 1932, has been acknowledged." (Political Department Proceedings No. B474-83, June 1937)

শরৎচন্দ্র লোকান্তরিত হয়েছেন ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুআরি।

সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন: "যতদিন তিনি (শরৎচন্দ্র) জীবিত ছিলেন, সরকার ও পুলিশ তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। তাঁহার "পথের দাবী" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল—তিনি যে কারারুদ্ধ হন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।"('ভারতবর্ষ', ফাল্গুন, ১৩৪৪, পৃ. ৪১৭-১৮)

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ১৯৩৮ সালের ২৪ জানুআরি, কাউন্সিলে বলেছেন:

"....Sarat Chandra belonged to Bengal in body, mind and spirit—a typical Bengali of the era—that complex character who is not dead to his past, not blind to his future, who is tossed by the mighty currents raging the world over, is receptive to the forces of modern age, but who is still questioning the ultimate value of it all. Sarat Chandra was a combination of all these forces. Indeed he had seen more of the different strata and sub-strata of our Bengali life than is usual with our literary men; and, has seen that, we are to remember, with those bright penetrating eyes which were his own and which welled up in sad tears of love and sympathy so frequently at what he had seen. This accounts for his sudden emergence from almost nowhere into great literary fame. As we read his first stories and novels, we

saw that here was a world, familiar to us all, but still never before unfolded to our conscious apprehension by any literary talent. Only a genius can see the essentials of the life around him and a genius alone can present it again. It was left to Sarat Chandra to reveal this world of love and hope, aspirations and frustrations to ourselves. We saw our truant boys and castaways, we recognised our sad tender womenfolk, that bloom and fade in unconscious grace and love within the fold of our joint family. Yes, we saw the tragedy of it all as well, the small failings, the crushing of the individuals, the slow poisoning of the fountains of human life, the denial of fulfilment of love and passion, except within the narrower bounds of orthodoxy and propriety. We saw them, but we saw also that the picture, though true was tinged by a genial humour and lighted by deep sympathy and wide charity of heart. That was Sarat Chandra's key to our hearts. He revealed us to ourselves as it were, our problems and passions, and our valuations and re-valuations of life and love and society. The emotional re-actions of the Bengalee to the reality of modern life and that of his own country, are mapped out thus for all time by a consummate artist, and thus his whole picture gallery at once becomes iustinct with life.

But Sarat Chandra was more than an artist. He had above all a human heart. Shy and retiring, he would open himself up to a few friends, and they alone could realise the greatness of the man behind the artist. Long association and close intimacy which we developed from the days of the late Deshbandhu Chittaranjan Das had offered me this precious opportunity, and I do not know if I am to mourn for

the literary genius who enriched the world of letters with the golden fruit of his mind, or if I am to silently bow to the blow of fate, against one of the finest specimen of humanity, whose talk it was a delight to hear, whose whimsical traits were interesting to watch, and whose kindness and charity for the suffering humanity was an ennobling experience to witness. Sarat Chandra is no more—but he will live for all time to come in the hearts of his countrymen." (Bengal Legislative Council, Official Report of the First Session, 1938, Vol. 1, No. 1, pp. 2—3).

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লির স্পীকার খান বাহাদুর আজিজুল হক, ১৯৩৮ সালের ৭ ফেব্রুআরি, অ্যাসেমব্লিতে বলেছেন ঃ

"Srijut Sarat Chandra Chatterjee's place in the field of Bengali literature is such as for many years have delighted thousands of hearths and homes in this province and outside. He died in an age unlike the age when he was born and he has **per excellence** in his literary works given expression as to what he had in his time seen, heard and felt since the early dawn of the 20th Century. He escaped, what we sometimes learn the terrible calamity of being a youthful prodigy. He began his life's career in circumstances which would have ordinarily chilled and choked the noble gifts of nature, but he succeeded in finding for himself an abiding place in the literature of Bengal wherein he gave expression to what there is in the average life of a Bengali, his joys and sorrows, his strength and weakness, his passion and emotion, his love and hatred, his wisdom and weakness, not merely in broader streets and avenues of life but in the many

narrow lanes and by-lanes in slums and bustees, in dismal and dark surroundings." (Bengal Legislative Assembly Proceedings, Volume LII, No. 1, pp. 2-3)

একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, ১৯৩৮ সালের ১৮ জুলাই, নোট দিয়েছেন :

"The notes and orders in confidential file 605/26 leading to the proscription of the book entitled "Pather Dabi" by the late Sarat Chandra Chatterjee, a distinguished novelist, under section 99A. Cr. P. C. 1898, may kindly be seen. The whole of the book is permeated with objectionable passages. The dominant intention in the book is to create hatred and discontent against the existing order of things. At places attempts have been made by the author to evade law but he had failed to conceal his real intention, which is to excite hatred and disaffection towards the Government. One of the dominant ideas in the book is that the cupidity of the European millowners has brought about grinding poverty of the labourers in India and brutalised them. Though the political situation in the country has improved to some extent the labour movement is gaining strength day by day and has become a menace to public safety. In view of the above facts it is not perhaps desirable now to lift the ban on the book."

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৩৮ সালের ৫ অগস্ট, লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে প্রশ্ন করেছেন :

"(a) Is the Hon'ble Minister in charge of the Home (Press) Department aware that the ban on the fiction "Pather Dabi" by the late Sarat Chandra Chatterjee has been removed by the Bihar Government ?

(b) If the answer to (a) is in the affirmative, will the Hon'ble Minister be please to state whether the Bengal Government contemplate removal of the ban for the said book ?

(c) If the ban is decided not to be removed, will the Hon'ble Minister be pleased to state the reasons for not removing the ban in this province."

স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা স্যর নাজিমুদ্দীন উত্তর দিয়েছেন :

"(a) I have no authoritative information.

(b) and (c) Do not arise."

সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী প্রশ্ন করেছেন :

"Will the Hon'ble Minster kindly communicate with the Bihar Government and inform us of the result of that communication at the next session of the Assembly ?"

স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা স্যর নজিমুদ্দীন উত্তর দিয়েছেন :

"I do not think it necessary to do so."

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রশ্ন করেছেন :

"Having regard to the fact that the ban has been removed by the Bihar Government, will the Hon'ble Minister consider the desirability of removing the ban here also ?"

স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা স্যর নাজিমুদ্দীন উত্তর দিয়েছেন :

"No" (Bengal Legislative Assembly Proceedings, volume LIII, No. 1, pp 199-200).

'পথের দাবী' সম্পর্কে অমিতা দেবী একখানা চিঠি লিখেছেন 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে'র সম্পাদককে। চিঠিখানা 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৮ সালের ২৮ অগস্ট :

"Replying to a question regarding the proscribed book the Hon'ble Home Member asked the respective authors to apply to the Government for the withdrawal of the ban.

The U. P. Government has withdrawn the ban on "Pather Dabi," a masterpiece of late Sarat Chandra. After the withdrawal of this ban we have not read or heard that anything untoward has happened.

I appeal to the Government of Bengal on behalf of the educated section of the public to withdraw the ban on this book which is an asset to the Bengali literature. I am quite confident that nothing unseemly will happen for this generous act for which the cultured class of Bengal will remain grateful."

এই চিঠিখানার সূত্রে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, ১৯৩৮ সালের ৩১ অগস্ট, লিখেছেন :

"This is not an application to Govt. from the heirs or successors of the author, who is now dead. ....Though we have no official information it is understood that the U. P. and the Bihar Govt. have withdrawn the ban on the book. Readers of the book are not many in those provinces. So there is no harm to them in lifting the ban. The case of Bengal, however, is different. This may perhaps be filed till we get representations from some recognised bodies or at least the demand of the public for withdrawal becomes insistent." (Political Department Proceedings No. B634-38, March 1939)

'নাট্যনিকেতনে'র ম্যানেজার প্রবোধচন্দ্র গুহ, ১৯৩৯ সালের ১২ জানুআরি, বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে লিখেছেন :

"I have the honour to request the favour of your kindly withdrawing the ban proscribing late lamented Sarat Chandra Chatterjee's novel PATHER DABI under the press Act.

The ban has been withdrawn by the Government of Bihar and Assam and we humbly request you to remove the ban from Bengal, for which act of kindness we shall ever pray."

এই চিঠিখানার উপর পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, ১৯৩৯ সালের ১২ জানুআরি, নোট দিয়েছেন :

"H. C. M. may kindly see p. u. d. in which the proprietor of "Natyaniketan" prays that the ban on the book "Pather Dabi" by the late Dr. Sarat Chandra Chatterjee may be lifted by Government presumably because he wants to have it dramatised and staged. He mentions that the Governments of Assam and Bihar have lifted the ban. This may perhaps be ascertained.

The matter does not fall within the purview of this Department, except in an indirect way, because the book may be dramatised and then the Radio station may want to broadcast it, when we would be asked to censor it.

I feel that it is high time that the question of lifting the ban were considered by Government. If there is nothing really objectionable in the book, in view of the changed conditions in the country, perhaps H. C. M. might like to examine, in conjunction with the Home Department, the advisability of withdrawing the ban from it. If that course were decided upon we in this Department could exploit it to Government's advantage."

ফজলুল হক, ১৯৩৯ সালের ১৩ জানুয়ারি, লিখেছেন :

"Will H. M. (Home) please advise ?"

স্বরাষ্ট্রসচিব, ১৯৩৯ সালের ১৬ জানুআরি, লিখেছেন :

"Will C. S. kindly let me have his views. As far as I remember this was considered by Government some time ago."

একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, ১৯৩৯ সালের ২০ জানুআরি, নোট দিয়েছেন :

"I do not consider that the fact that the ban may have been lifted elsewhere forces us to do so, although it is naturally a ground for again examining the matter in the light of present conditions.

From the very full analysis given by the Advocate General in 1926, it seems to me that the doctrine and tendency of the book, undoubtedly actionable at law, is just as dangerous now as then, if not more so. H. M. has asked for chief secretary's views."

চীফ সেক্রেটারি, ১৯৩৯ সালের ২১ জানুআরি, লিখেছেন :

"H. M.'s note, dated 16th January, 1939, prepage will recall. The book, **Pather Dabi,** has been fully reviewed in Sir B. L. Mitter's note, dated 11th December, 1926, in the file below. In my opinion, very little is gained by proscribing it under section 99A, Criminal Procedure Code. I understand that the book is known to practically every student of Bengali literature and to all who read Bengali literature for the sake of diversion. It follows that the object of proscribing the book cannot be attained so that against the advantages of proscription i. e. restricting to some extent the sale and purchase of the book, must be set off the following disadvantages :—

(a) Ineffectiveness of proscription in preventing perusal of the book. It is always undesirable to use the law in a manner which must be ineffective.

(b) Attachment of a certain amount of odium to

Government for the proscription of a book which is now regarded as a Bengali classic.

Furthermore, we are so accustomed now to the vitupera-tion of "Capitalism", "Imperialism" and "exploiters" that it seems useless proscribing a less virulent book like **Pather Dabi,** while allowing, or failing to suppress, a much greater degree of licence in present-day speeches and writings.

On the whole, I should be inclined to let the proscription drop if it is considered that any political advantage can be gained in showing that the Ministry takes a liberal view.

It has not been confirmed that the Bihar Government have removed the ban on **Pather Dabi,** but I should think that it is quite probable that they have done so. If so, the argument for lifting the proscription is, in my opinion, strengthened to some extent, because it would be anomalous for e. g. a passenger from Patna to Calcutta to be liable to have his copy of **Pather Dabi** confiscated when he crosses the Bengal boundary."

স্বরাষ্ট্রসচিব, ১৯৩৯ সালের ২২ ফেব্রুআরি, লিখেছেন :

"In view of the considerations stated above I agree that the ban may be withdrawn. I do not consider that this will in any way help the ministry."

বেঙ্গল গবর্নমেণ্ট, ১৯৩৯ সালের ১ মার্চ, লিখেছে :

"In exercise of the power conferred by Sec. 99A of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) read with Sec. 21 of the general clauses Act 1897 (Act X of 1897) the Governor is pleased to rescind notification No. 103P dated the 4th January 1927 declaring forfeited to His Majesty all copies of the Bengali book "Pather Dabi" written

by Sri Sarat Chandra Chattopadhyay printed by Sri Satya Kinkar Bandyopadhyay at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta, and published by Sri Umapada (?) Mukhopadhyay, 77, Ashutosh Mukherji Road, Calcutta." (Political Department File No. 50/39 of 1939)

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে, ১৯৩৯ সালের ৮ মার্চ, খান সাহেব আবদুল হামিদ ও কামিনীকুমার দত্ত প্রশ্ন করেছেন :

"(a) Are the Government aware of the only resolution passed at a huge public meeting at Albert Hall on the occasion of the first death anniversary of the great Bengali Writer, Sarat Chandra Chatterji, requesting the Government of Bengal to withdraw the order of proscription of his book "Pather Dabi"?

(b) Are Government also aware that similar requests have been made to different provincial Governments including United Provinces and Assam for removal of the ban on the book "Pather Dabi", and is it a fact that some of the provincial Governments have already agreed to comply with the said public demand?

(c) Do Government propose to give effect to the said resolution? If not, why not?"

উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা স্যর নাজিমুদ্দীন জানিয়েছেন :

"The order in question was recently rescinded". (Bengal Legislative Council Debates, First Session, 1939, Vol. I, p. 505).

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৯ সালের ৯ মার্চ।

'অ্যাডভান্স', ১৯৩৯ সালের ৯ মার্চ, লিখেছে :

"The Government of Bengal have removed the ban on

শ্রীচরণেষু

[illegible] পত্র [illegible] । [illegible], [illegible] । [illegible]

[illegible] কিন্তু সে কিছুই নয় ।

আপনি যা [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible] ও [illegible] । কিন্তু [illegible]

সে [illegible] ও [illegible], [illegible] ও [illegible] । [illegible]

[illegible] যদি [illegible] পারি ।

আপনি লিখেছিলেন ইংরাজ [illegible] প্রতি [illegible]

[illegible] । কিন্তু এ যদি [illegible]

[illegible] ও [illegible] ছিল ।

কিন্তু [illegible] । [illegible] politician এর propaganda

হয়, কিন্তু [illegible] । [illegible] এ [illegible]

[illegible] । [illegible]

[illegible] । [illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

[illegible] এ [illegible] । [illegible] ও [illegible] । [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

[illegible] । এ [illegible] ও [illegible] । কিন্তু

এ [illegible] । এ [illegible] । কিন্তু [illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible], কিন্তু [illegible] প্রয়োজন নয়?

[illegible] ও [illegible], [illegible] ও [illegible]

[illegible] । [illegible], [illegible] ।

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] fail authority [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমার খুব ইচ্ছা আপনাকে এ বা অন্যান্য কারণে justification দিই আর, আমার অবস্থার জন্য just [illegible] justification ও দেখাই আছি।

আমার প্রতি আপনি এই প্রতিবাদ, অনুরোধ যে আমি যেন আমি এতদিন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলছি রেখেছি এবং সেই যাঁদের নিয়ে সব দেখা দেখেছি তাদের কাছে। কিন্তু অসুবিধা হওয়া নয়। আমার সেখানে যদি প্রতিটা না করে আমাকে করতেই হয়। কিন্তু যে ঐ ঐ করে না, আর এখানে যাই দিয়ে।

আপনি নিজে এতদিন ধরে আমার কাছে কিছু আছেন, আমার পরিবারের অভিভাবক ও আমাদের প্রত্যেকের আপনি যদি শুধু আমাকে এই দুঃখ আমার নিজের যে [illegible] আমার সংসারে আমার সম্বন্ধে যদি সেই সেই আমার আমাকে দেখতে। সত্যিই খুব হয়, আমার ও খুব হবেই মনে করবেন।

আমার [illegible] আমার মধ্যে সাহিত্যের প্রতিভার বিষয়ে [illegible] প্রতিভা [illegible] ইংরেজ প্রভাবে আমাদের কোনদিন যা না হয় ও [illegible] [illegible] প্রভাব সাহিত্য উপদেশ [illegible] pre-eminent [illegible] কিছুই ছিলনা।

আমি অনেক দিন নিজেই আর নিজে এ বিষয়ে আপনাকে লিখছি, যা মনে হয়েছে তার একটা [illegible] [illegible]। আমার মনে হয় কোন ধারণা আমার [illegible] আমি খুব ভাল দেখায়। আমি অন্যদের তুলনায় খুব [illegible] [illegible] [illegible] নিজের মনে এখন আছি। [illegible] [illegible] কিছু [illegible] কোন [illegible] হয়নি। নিজ ও [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] কিছু [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এ [illegible] [illegible] আছি। [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]

Sarat Chandra Chatterji's famous novel "Pather Dabi". The ban should have been lifted at least two years back. However, better late than never. There are many other well-known books on the banned list. The present Government of Bengal have failed to initiate any liberal policy regarding censorship of books and literature. They have shown themselves as illiberal as thc old regime."

'অমৃতবাজার পত্রিকা', ১৯৩৯ সালের ৯ মার্চ, লিখেছে :

"Better late than never ; we are glad that the meaningless ban on Sarat Chandra's outstanding production, "Pather Dabi," has at last been lifted. We had been wondering for long with our readers why a perfectly blameless novel by one of the foremost writers of Bengal should have incurred official displeasure. The fact that it has an alleged revolutionary as its main character need not have led to its suppression. The too watchful gentlemen who smelt sedition, anarchy and what not in its pages appear to have taken too long to discover their mistake. If they peruse the book once again with mind unbiased, we are sure they themselves will find it as harmless as it is enjoyable".

'নবশক্তি', ১৯৩৯ সালের ১০ মার্চ, লিখেছে : "বাঙ্গলা সরকার 'পথের দাবী' উপন্যাস হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইয়াছেন। বহুতর সদ্‌গ্রন্থের উপর নিষেধাজ্ঞা জাহির করিয়া ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের উপর এবং সাহিত্যের প্রতি যে ঘোর অবিচার করিয়াছিলেন, 'পথের দাবী'র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে তাহা আংশিকভাবে ক্ষালিত হইয়াছে। সাহিত্যে হেতুবিহীন রাজরোষের যদৃচ্ছা প্রয়োগ শাসকের শুভবুদ্ধির চিহ্ন নহে, বরং আত্মিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। রাজরোষে আপতিত অন্যান্য

গ্রন্থাদির উপর হইতেও সরকারী জুলুম অবিলম্বে উঠাইয়া লইতে আমরা বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছি।"

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ থেকে দেখা যাচ্ছে: 'পথের দাবী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে অথবা ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে (২৯ এপ্রিল ১৯৩৯), ডবল ক্রাউন ষোলোপেজী ফর্মা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১+৪২৬, দাম তিনটাকা, ছাপা হয়েছে ৫২০০ কপি; মুদ্রাকর—প্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা; প্রকাশক—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৭৭, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোড, ভবানীপুর, কলকাতা।

রবীন্দ্র-শরৎ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' প্রকাশিত হয়েছে ১৯০৩ সালে, 'নৌকাডুবি' ১৯০৬ সালে। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে বই দুখানা যোগাড় করেছেন, পরম যত্নে পড়েছেন। এ-বিষয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে শরৎচন্দ্র বলেছেন—ওহে, আমার মতন এমন করে রবিবাবুর বই বোধ হয় কেউ পড়েনি। আমি বলে দিতে পারি কোন কথাটার পর ঠিক কোন কথাটা বইতে আছে।

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্র একদিন যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে এক টুকরো লেখা কাগজ দিলেন। বললেন—ওহে সরকার, তোমরা তো বাঙলা পদ্য লেখ দেখি, আমার এইটুকুন কেমন হল? ভুল থাকলে সংশোধন করে দিও।

দু-তিনবার খুব মন দিয়ে লেখাটা পড়লেন যোগেন্দ্রনাথ। বললেন—শরৎদা, এ কেমন পরীক্ষা আপনার? এ যে রবীন্দ্রনাথের রচনার মতো বুঝতে বড় সময় লাগে! মনে হয় রবীন্দ্রনাথের লেখার পরেই আপনার লেখা।

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন—পরেই বটে সরকার! কিন্তু তফাত কেমন বুঝলে? যেন আকাশ ও পাতাল!

—কেন, আকাশ ছেড়েই যে একেবারে পাতালের কথা মনে এল শরৎদা!

—তা ছাড়া আর কি সরকার—রবিবাবুর লেখাও পড়ি, আর-আর সব লিখিয়েদের লেখাও পড়ি। কিন্তু নাম করতে হলে কাউকেই তেমন খুঁজে পাইনে।

দু-একজন বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকের নাম করলেন যোগেন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র ভুরু কুচকে বললেন—তবে ও-রকম কবি

বা সাহিত্যিক হওয়া একটু চেষ্টা সাপেক্ষ। ছাখো তো দেখি রবীন্দ্রনাথের কবিতা কত সুন্দর—

"জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও হয় নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা—
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥"

বলতে বলতে শরৎচন্দ্রের ছুচোখ জলে ভরে উঠল।

টেলিগ্রাম এল, রবীন্দ্রনাথ রেঙ্গুন আসছেন।

স্বনামধন্য কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যা সুজাতার শ্বশুর পূর্ণচন্দ্র সেন তখন রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যারিস্টার, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি একদিন টেলিগ্রামখানা গিরীন্দ্রনাথ সরকারের হাতে দিয়ে বললেন—গিরীন্দ্র, রবিবাবু আসছেন, তিনি আমার বাড়িতে থাকবেন। এখন শহরবাসীর পক্ষ থেকে যাতে তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা হয় তুমি তার বন্দোবস্ত করো।

ওখানে বাঙালীসমাজে গিরীন্দ্রনাথ গণ্যমান্য মানুষ, সবরকম বাঙালী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে তিনি অগ্রণী।

পূর্ণচন্দ্র তারপর গিরীন্দ্রনাথকে বললেন—এবার রবিবাবুর জন্য ভালো করে ছুখানা অভিনন্দনপত্র লিখতে হবে, একখানা বাঙলায়, আরেকখানা ইংরেজীতে। যা তা লিখলে আমরা হাস্যাস্পদ হব অভ্যর্থনাসভায় বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এমন কি লাটসাহেব পর্যন্ত আসতে পারেন।

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—বাঙলার ভার আমি নিলাম, আপনি ইংরেজী লেখার ভার নিন।

পূর্ণচন্দ্র হাসলেন। বললেন—তোমার বাঙলা লেখার দৌড় আমি জানি, ও লেখা রবিবাবুর আসরে চলবে না।

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—আমি নিজে লিখব না, একটি সাহিত্যিক বন্ধুকে দিয়ে লেখাব।

পূর্ণচন্দ্র বললেন—কে তোমার সাহিত্যিক বন্ধু? তাঁর নাম কী?

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—তাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিসে চাকরি করেন।

প্রশ্ন উঠল ঃ সভায় গান কে গাইবেন?

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—শরৎবাবুকেই ধরব। তবে তিনি বড় লাজুক, সভাসমিতিতে আসতে চান না।

সভায় শরৎচন্দ্র উদ্বোধনসঙ্গীত গাইতে রাজী হলেন। বাঙলা-ভাষায় একখানা অভিনন্দনপত্র লিখে দিলেন। অভিনন্দনপত্রখানা পূর্ণচন্দ্রকে দেখালেন গিরীন্দ্রনাথ। পড়ে 'বিশেষ প্রীত' হলেন পূর্ণচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ, ১৯১৬ সালের ৭ মে, রেঙ্গুনে এসেছেন। পরদিন জুবিলীহলে বিরাট জনসভায় তিনি সংবর্ধিত হয়েছেন। সভায় গিরীন্দ্রনাথ সংবর্ধনা-কমিটির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেছেন। কিন্তু সভায় শরৎচন্দ্র অনুপস্থিত থেকেছেন। গিরীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "এই সভায় শরৎচন্দ্রের উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বভাব-জাত দৌর্ব্বল্য বশতঃ তিনি শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়া গান করিতে অস্বীকার করিলেন। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ভৎ‍র্সনা করায় তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন হে? আবশ্যক হয় তোমার কবি সম্রাট নিজেই একখানা গেয়ে নেবেন এখন।"

শরৎচন্দ্রের লেখা অভিনন্দনপত্রখানা সভায় পাঠ করেছেন নির্ম্মলচন্দ্র সেন :

"শ্রীযুত সার্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট, ডি, লিট্,

মহোদয় শ্রীকরকমলেষু—

কবিবর,

এই সুদূর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট্— আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনি অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভাবলে নব নব সৌন্দর্য্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং নব সুরে, নব রাগিণীতে বঙ্গহৃদয়কে এক নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনার কাব্য-কলার সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্যহৃদয়ের এক অভিনব পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার কাব্য-বীণায় সহস্র অনির্ব্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্য শিব সুন্দরের অনাদি গাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানব হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টির অণু পরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে, এবং এক অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, এবং আপনাকে—কোন দেশ বা যুগ-বিশেষের নয়—সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি।

আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সঙ্গীতে যে মহান আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃত সত্তার আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।

আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী-সাধনা আজ যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্ণ-উপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দগীতি নিখিল মানবহৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার সুমোহন কাব্য বীণায় নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা। ইতি—

রেঙ্গুন,
২৫শে বৈশাখ,
১৩২৩ বঙ্গাব্দ

ভবদীয় গুণমুগ্ধ—
রেঙ্গুন-প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানগণ।"

সভায় শরৎচন্দ্র, আগেই বলা হয়েছে, অনুপস্থিত। গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেনঃ "সভায় অসম্ভব জনতা হইয়াছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র কথার ঠিক রাখিতে না পারায় লজ্জায় এ সভায় উপস্থিত হন নাই।"

সন্ধ্যার পর শরৎচন্দ্র এলেন গিরীন্দ্রনাথের বাড়িতে। গিরীন্দ্রনাথ বললেন—শরৎদা, আজ জুবিলীহলে তোমার গুরুদেবকে দেখবার জন্য সহরসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছিল, শুধু তুমি অনুপস্থিত, এই কি তোমার গুরুভক্তি?

শরৎচন্দ্র বললেন—ভাই, তুমি তো জানো যে সভাসমিতির হাওয়া আমার ধাতে মোটেই সহ্য হয় না। নির্জনে খানিকক্ষণ বসে রবিবাবুর কথাবার্তা শুনতে ভারি ইচ্ছা হয়। উনি যাবেন কবে?

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—কাল দুপুরেই ওঁর স্টীমার ছাড়বে।

শরৎচন্দ্র বললেন—তোমার তো মিস্টার সেনের বাড়িতে অবাধ গতিবিধি আছে, চলো না কাল তোমার সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করে আসি।

গিরীন্দ্রনাথ রাজী হলেন।

পরদিন সকালে। শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ণচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে গিরীন্দ্রনাথ দেখলেন ড্রয়িংরুমে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক বসে আছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেখানে নেই।

একত্র এত অচেনা মানুষ দেখে শরৎচন্দ্রের মুখ শুকিয়ে গেল। গিরীন্দ্রনাথ অতি কষ্টে তাঁকে পূর্ণচন্দ্রের সামনে নিয়ে গিয়ে বললেন—ইনিই বাঙলা অভিনন্দনপত্রখানার লেখক শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রকে বসতে অনুরোধ করলেন পূর্ণচন্দ্র।

আর গিরীন্দ্রনাথ চললেন উপরে, রবীন্দ্রনাথের খোঁজে। সিঁড়িতে সুজাতার সঙ্গে দেখা। তিনি গিরীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন একা উপরের হলঘরে পায়চারি করছিলেন।

সুজাতা চলে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় সুজাতা ফিরে এসে খবর দিলেন যে নীচে একজন ইংরেজ ফোটোগ্রাফার গিরীন্দ্রনাথকে খুঁজছেন।

গিরীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে বললেন—নীচে আমরা আপনার সঙ্গে একটি গ্রুপফোটো তোলবার বন্দোবস্ত করেছি।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—আমার আবার ফোটো তোলা কেন?

সুজাতা বললেন—গিরীনবাবু যখন এসেছেন তখন ছাড়বেন না, আপনাকে যেতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—আচ্ছা সুজাতা, তুমি যখন বলছ তাই হবে!

বলে সাজবদল করতে ঘরে ঢুকলেন।

সুজাতার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে গিরীন্দ্রনাথ নীচে নেমে দেখলেন, শরৎচন্দ্র সিঁড়ির কাছে উৎকণ্ঠিত ভাবে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছেন।

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—শরৎদা, একটু অপেক্ষা করো, রবিবাবু আসছেন, এখুনি গ্রুপফোটো তোলা হবে।

শরৎচন্দ্র বললেন—সে তোমাদের জন্য। আমার মতো চড়াই-পাখির রবিবাবুর সঙ্গে বসে ফোটো তোলানো সাজে না।

রবীন্দ্রনাথ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। দেখেই শরৎচন্দ্র হনহন করে ফটক পার হয়ে গেলেন। গিরীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু সাধারণের মধ্যে আসিয়া মেলামেশা করিতে তিনি বড়ই ভয় পাইতেন।"

গ্রুপফোটো তোলা হল।

শরৎচন্দ্র পরে গিরীন্দ্রনাথের বাড়িতে এই গ্রুপফোটোখানা দেখে সমালোচনা করে বললেন—তুমি যখন এ কাজের মোড়ল ছিলে, তখন রেভারেণ্ড এনড্রুস ও পিয়ার্সন সাহেবকে পিছনে দাঁড়াতে দিয়ে তোমার চেয়ারে বসা উচিত হয়নি।

গিরীন্দ্রনাথ বললেন—কী করব শরৎদা, রবিবাবুর সাজসজ্জা করতে খুব বিলম্ব হওয়ায় ফোটোগ্রাফার ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, আমি রবিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আসামাত্রই এনড্রুস সাহেব আমাকে তাঁর চেয়ারখানিতে বসিয়ে দিলেন, দুজনে কিছুক্ষণ 'আপ বৈঠিয়ে, আপ বৈঠিয়ে' করতে করতেই ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল।

কথা শুনে শরৎচন্দ্র হেসে উঠলেন। এক কপি ফোটো নিয়ে গেলেন।*

শরৎচন্দ্র, ১৯১৬ সালের ২ অক্টোবর, লিখেছেন:

---

* রেঙ্গুনে এই রবীন্দ্র-সংবর্ধনায় শরৎচন্দ্রের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এবং এ-বিষয়ে তিনি বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করেছেন। দ্রষ্টব্য—গিরীন্দ্রনাথ সরকার: ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, কলকাতা, ১৯৩৯, পৃঃ ২২২—৩৩।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সতীশচন্দ্র দাস লিখেছেন: "তিনি (শরৎচন্দ্র) বোধ হয় ১১ই এপ্রিল তারিখে রেঙ্গুন ছাড়িয়াছিলেন। পাঠকপাঠিকার নিকটে নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া গেল না, কারণ তিনি চাকরী ছাড়িয়াও সামান্য কয়দিন

"একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, আপনি রবিবাবুর সব কবিতার মানে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

আমি বলি, না, পারি না। তার কারণ, আপনি বেদান্তে বড় পণ্ডিত হ'লেও কাব্য বোঝবার পণ্ডিত ন'ন। তাছাড়া সব কবিতার মানে সবাইকে যে বুঝতেই হবে এমন কিছু মাথার দিব্যি দেওয়াও নাই। রবিবাবুর 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' পড়ে গুরুদাসবাবু বলেছিলেন এমন অশ্লীল বস্তু ইতিপূর্ব্বে তিনি দেখেন নাই। সুতরাং কথাটা স্যার গুরুদাসের মুখ থেকে বার হয়েছে বলেই মেনে নিতে হবে এবং না নিলে মারাত্মক অপরাধ হবে তাও ত নয়।"

১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে দেখা যাচ্ছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে 'বিচিত্রা' নামে একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু দু-বছর আগে বাড়ির সামান্য একটি বিদ্যালয় হিসেবে 'বিচিত্রা'র জন্ম হয়েছিল। ১৯১৭ সালে শরৎচন্দ্র প্রায়ই বিচিত্রাভবনে এসেছেন। একদিন প্রশ্ন উঠেছে: শরৎচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' পড়েছেন? উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছেন— গোরা! চৌষট্টিবার—চৌষট্টিবার পড়েছি।

বর্মাতে অবস্থান করিয়াছিলেন।" (সতীশচন্দ্র দাস: শরত প্রতিভা, কলকাতা, ১৯৪০, পৃঃ ৮৮)

সতীশচন্দ্র দাস কিংবা আর কেউ, আমার বিবেচনায়, অদ্যাবধি এমন কোনও অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন নি যার উপর নির্ভর করে গিরীন্দ্রনাথের আলোচ্য বিবরণ বাতিল করা যুক্তিসঙ্গত। আমার বিবেচনায়, কোনও অকাট্য প্রমাণ ছাড়া গিরীন্দ্রনাথের আলোচ্য বিবরণ বাতিল করে দিলে ইতিহাসের প্রতি সুবিচার হয় না।

এখানে বলা দরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তিনি (শরৎচন্দ্র) রেঙ্গুন ত্যাগ করেন।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৫২, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৫২, পৃঃ ৮)

কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রজেন্দ্রনাথ মত পরিবর্তন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। শরৎচন্দ্র, ১৯১৮ সালের ১৩ জানুআরি, রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

"আমাদের পাড়ায় একটি ছোটখাটো সাহিত্যসভা আছে। দু'এক মাস অন্তর কাহারো বাটীতে তাহার অধিবেশন হয়। নিতান্তই নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যাপার।....

কয়েক দিন হইতে আমরা ক্রমাগত তর্কাতর্কি করিয়াও মীমাংসা করিতে পারিতেছি না এ সভায় আপনার পায়ের ধুলা পড়ার কিছু-মাত্র সম্ভাবনা আছে কিনা।

এবার যখন বাড়ী আসিবেন, যদি অনুমতি দেন, আমরা গিয়া আপনার কাছে আবেদন করি।"

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন নলিনীকান্ত ভট্টশালীকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে গেছেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখেছেন : "সেই সন্ধ্যায় "বিচিত্রা" নাম্নী সাহিত্য-সভার এক অধিবেশন ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। আমি আর চারুবাবু সভাকক্ষের বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র মোটা চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, চারুবাবু আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। অল্প পরে আরও কয়েকজন সাহিত্যিক আগমন করিলেন, বিস্তর মহিলা আসিয়া সভার একার্দ্ধ ভরিয়া ফেলিলেন। ফরাস পাতা, সকলে তাহার উপরই বসিতেছিলেন। মেয়েরা এক ধারে, পুরুষেরা অপর ধারে। এইবার রবীন্দ্রনাথ সভাস্থলে আগমন করিলেন তাঁহার সেই দীর্ঘ, কালো পোশাক পরিয়া। শরৎবাবু তাঁহার কাছ ঘেঁষিয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শরৎবাবু পরবর্তী অধিবেশনে স্বরচিত নূতন গল্প পড়িয়া শুনাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহার পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।" কিন্তু সেদিন তারিখ কত? সম্ভবত ১৯১৮ সালের ২০ মার্চ। (নলিনীকান্ত

ভট্টশালী : ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ, 'শনিবারের চিঠি,' আশ্বিন, ১৩৪৮, পৃ. ৮৪৩-৪৪)

জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা'য় শরৎচন্দ্র, ১৯১৮ সালের ২৮ মার্চ, একটি গল্প পড়েছেন। গল্পটির নাম 'বিলাসী'। সুকুমার বসু লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিন একটা গল্প পড়েছিলেন। ফোটোতে তাঁর যে গোঁফদাড়ি-কামানো চোখালো চেহারার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেই সময়ে তাঁর সে চেহারা ছিল না। তার মাত্র বছরখানেক আগে বর্মাপ্রবাস ছেড়ে তিনি দেশে এসে বসেছেন। লেখক বলে খুব নামডাক হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার সাহিত্যসমাজে তিনি তখনও ব্যক্তিগতভাবে তত পরিচিত হন নি। চেহারায় কিছুমাত্র পালিশ ছিল না। প্রচুর কালো গোঁফদাড়ি ছিল, চুল অপরিপাটি। দেহ সামান্য মোটার দিকে, সার্ট বা কোটের উপর একটা চাদর গায়ে থাকত। ফরাসের উপর আমরা তাঁকে ঘিরে বসেছিলাম।....গল্পে কৌতুক ও শ্লেষ যথেষ্ট ছিল—শ্রোতারা খুব হেসেছিলেন, কবি সুদ্ধ।" (সুকুমার বসু : বিচিত্রা-পর্ব, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা,' বৈশাখ-আষাঢ়,)

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তখন প্রত্যেক সপ্তাহে আসর বসে, অনেকে আসেন, গান-বাজনা আলাপ-আলোচনা চলে। ঢালা আসর, জুতো খুলে বসতে হয়। কিন্তু সেখানে জুতো চুরি আরম্ভ হয়ে গেল।

তখন কেউ পরলেন ছেঁড়া পুরনো জুতো, কেউ কেউ জুতো না খুলে ও হলে না ঢুকে পাশের বারান্দায় পায়চারি আরম্ভ করলেন, অনেকেই জুতোর দিকে মন রেখে গান-বাজনা ও আলাপ-আলোচনা শুনতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্র খবরের কাগজে নিজের জুতোজোড়া মুড়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে গিয়ে বসলেন। আসরে সেদিন বিস্তর লোক।

কে একজন চুপে চুপে রবীন্দ্রনাথের কাছে শরৎচন্দ্রের গোপন কথা বলে দিয়ে এলেন।

রবীন্দ্রনাথ মুখ টিপে হেসে বললেন—শরৎ, তোমার কোলে ওটা কী?

শরৎচন্দ্র মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন—আজ্ঞে, বই!

—কী বই শরৎ, পাদুকা-পুরাণ?

লজ্জায় শরৎচন্দ্র আর মুখ তুলতে পারলেন না। (হেমেন্দ্রকুমার রায়ঃ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃ. ৯৫)

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট, ১৯১৫ সালের জুন মাসে, রবীন্দ্রনাথকে 'স্যর' খেতাব দিয়েছে। পঞ্জাবে ব্রিটিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ওই খেতাব বর্জন করেছেন ১৯১৯ সালের ৩০মে। শরৎচন্দ্র, ১৯১৯ সালের ১৬ অগস্ট, লিখেছেনঃ "সি আর দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ-সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কি না বলুন।"

রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে পৌঁছেছেন ১৯২০ সালের জুনমাসে। সেবার প্রায় চোদ্দমাস কাটিয়েছেন ইওরোপ ও আমেরিকায়। স্বদেশে ফিরে এসেছেন ১৯২১ সালের জুলাই মাসে।

শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের সমক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' নামে একটি প্রবন্ধ পড়ে শোনালেন ১৯২১ সালের ১০অগস্ট। কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ, ১৯২১ সালের ১৫ অগস্ট, 'শিক্ষার মিলন' পাঠ করলেন। আলফ্রেড থিয়েটারে অনুষ্ঠিত আরেকটি সভায় রবীন্দ্রনাথ, ১৯২১ সালের ১৮ অগস্ট, আবার 'শিক্ষার মিলন' শোনালেন। 'শিক্ষার মিলন' প্রকাশিত হয়েছে 'প্রবাসী'তে—১৩২৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে (পৃ. ৭৭৫-৮৬)। 'শিক্ষার মিলন' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করিঃ

"এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েচে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করচে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখচি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্চে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে ; মনে মনে ভাবি—যে-মানুষটা খাচ্চে ওটাকে একবার সুযোগমত পেলে হয়। কিন্তু ওটাকে পাব কি, এই আমাদের পেয়ে বসেচে ; সুযোগ এপর্য্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

কিন্তু কেন এসে পৌঁছয় নি? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েচে? নিশ্চয় সে কোনো একটা সত্যের জোরে।···

···পশ্চিমের লোকে যে-বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেচে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা বিদ্যা যে সত্য। কিন্তু একথা যদি বল, শুধু ত বিদ্যা নয়, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সয়তানীও আছে, তাহলে বলতে হবে ঐ সয়তানীর যোগেই ওদের মরণ। কেননা সয়তানী সত্য নয়।····

····বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেচে, আর তারা বাইরের জগতের সকল সঙ্কট তরে' যাচ্ছে। এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায়, এবং দায়ে ঠেকলে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে, বাইরের বিশ্বে তারা সকলদিকেই মার খেয়ে মরচে, তারা আর কর্ত্তৃত্ব পেল না।·······

মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি

দেবার ভার যে পেয়েচে তার বাসাটা পূর্ব্বেই হোক্ আর পশ্চিমেই হোক তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে।....

বর্ত্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার সঙ্গতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গণ্ডী-দেবতার যারা পূজারী, তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চ্চা করাকে কর্ত্তব্য মনে করে।....

স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্ব্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে।...স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, সেইজন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয়, যে, অতীতযুগের যে-আবর্জ্জনাভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্র দেবতার হুকুম এসে পৌঁচেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগতে সুরু করেচে, আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জ্জনার পীঠ স্থাপন করে আজ যুগান্তরের প্রত্যুষেও তামসী-পূজাবিধি দ্বারা তার অর্চ্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সার্ব্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্বোধন এনে দেবে না?

এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব্বপশ্চিমের মিলন-নিকেতন করে তুলতে হবে এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটেনি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই।....

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব্বভূভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্ত্তে সে বিশ্বের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণের

অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর-মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি এই মানসম্মানের কথা এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে, কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্ম্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব, নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব।...."

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচ্য বিষয়ে শরৎচন্দ্র একমত হতে পারেন নি। 'শিক্ষার বিরোধ' নামে শরৎচন্দ্রের একটি রচনা 'গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা আয়তনে' পঠিত হয়েছে। 'শিক্ষার বিরোধ' প্রকাশিত হয়েছে 'বাঙ্গলার কথা'য়—১৯২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর (পৃঃ ৫-১০); ১৯২১ সালের ৭ অক্টোবর (পৃঃ ১৬-১৮)। 'শিক্ষার বিরোধ' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি ঃ

"এতদিন এদেশে শিক্ষার ধারা একটা নির্ব্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে চলে আসছিল। সেটা ভাল কি মন্দ এ বিষয়ে কারও কোন উদ্বেগ ছিল না। আমার বাবা যা পড়ে গেছেন, তা আমিও পড়ব। এর থেকে তিনিও যখন দু'পয়সা করে গেছেন, সাহেব-সুবোর দরবারে চেয়ারে বসতে পেরেছেন, হ্যাণ্ড-শেক করতে পেরেছেন, তখন আমিই না কোন পারব? মোটামুটি এই ছিল দেশের চিন্তার পদ্ধতি। হঠাৎ একটা ভীষণ ঝড় এল। কিছুদিন ধরে সমস্ত শিক্ষাবিধানটাই বনিয়াদ সমেত এমনি টলমল করতে লাগল যে, একদল বললেন পড়ে যাবে। অন্যদল সভয়ে মাথা নেড়ে বললেন না, ভয় নেই—পড়বে না। পড়লও না। এই নিয়ে প্রতিপক্ষকে তাঁরা কটু কথায় জর্জ্জরিত করে দিলেন। তার হেতু ছিল। মানুষের শক্তি যত কমে আসে মুখের বিষ তত উগ্র হয়ে ওঠে। বাইরে গাল তাঁরা

ঢের দিলেন, কিন্তু অন্তরে ভরসা বিশেষ পেলেন না। ভয় তাঁদের মনের মধ্যেই রয়েই গেল দৈবাৎ বাতাসে যদি আবার কোনদিন জোর ধরে ত এই গোড়া-হেলা নড়বড়ে অতিকায়টা হুমড়ি খেয়ে পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবে না।

এমনি যখন অবস্থা তখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরে এলেন, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে উপর্য্যুপরি কয়েকটা বক্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবলি ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত করে বসি। কিন্তু এ তো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়,—যা তাঁরও বহু পূজ্য,—সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত। তাঁর কথা নিয়ে কয়েকটা অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান কাগজ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে তাদের প্যাঁচালো উপদেশের আর বিরাম নেই।

কবি প্রথমেই বলেচেন, "এ কথা মানতেই হবে যে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েচে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করেছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল।.... অধিকার ওরা কেন পেয়েচে? নিশ্চয়ই সে কোন্ একটা সত্যের জোর।

আজকের দিনে এ কথা অস্বীকার করার যো নেই যে পৃথিবীর বড় বড় ক্ষীর ভাণ্ডেই সে মুখ জুবড়ে আছে,—তার পেট ভরে দুই কস বেয়ে দুধের ধারা নেমেছে,—কিন্তু আমরা উপবাসী দাঁড়িয়ে আছি।

এ একটা fact; আজকের দিনে একে কিছুতেই না বলবার পথ নেই,—আমরা উপবাসী রয়েছি সত্যই কিন্তু তাই বলেই কি এ কথা মানতেই হবে যে, এ অধিকার পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই একটা সত্যের জোরে! এবং এই সত্য তাঁদের কাছ থেকে আমাদের

শিখতেই হবে। লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এক একটা fact. কিন্তু একেই যদি মানুষে চরম সত্য মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত ত আজকের দিনে নীচে জলের উপর এবং ঊর্দ্ধে আকাশের মধ্যে লোহার জাহাজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপস্থিত কালে যা fact তাই কেবল শেষ কথা নয়। মাসের ১লা তারিখে যে লোকটা তার বিদ্যের জোরে আমার সারা মাসের মাইনে গাঁট কেটে নিয়ে ছেলেপুলে সমেত আমাকে অনাহারে রাখলে, কিম্বা মাথায় একটা বাড়ি মেরে সমস্ত কেড়ে নিয়ে রাস্তার ওপরে চাটের দোকানে বসে ভোজ লাগালে—এ ঘটনা সত্য হলেও কোন সত্য অধিকারে বলতে পারব না কিম্বা এ দুটো মহাবিদ্যে শেখবার জন্যে তাদের শরণাপন্ন হতে হবে এও স্বীকার করতে পারব না। তা ছাড়া গাঁটকাটা কিছুতেই বলে দেবে না পয়সা কোথায় রাখলে কেটে নেওয়া যায় না, অথবা ঠেঙালেও শিখিয়ে দেবে না কি কোরে আর তার মাথায় উল্টে লাঠি মেরে আত্মরক্ষা করা যায়। এ যদি বা শিখতেই হয়, ত সে অন্য কোথাও—অন্ততঃ তাদের কাছে নয়। কবি জোর দিয়ে বলেছেন, এ কথা মানতেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্য বিদ্যার অধিকারে। হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেই রকমই দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেচে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্য বিদ্যা, অতএব শেখা চাইই এ কথা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না।···· কিন্তু কে বলেচে সত্যকার বিদ্যা যদি কিছু তার থাকে তা শিখতে হবে না ? কে বলেচে তার দ্বার পশ্চিমমুখো থাকায় তাকে অহিন্দু বলে বয়কট করতে হবে ? কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়ন-শাস্ত্র, কি ধনবিজ্ঞান—এ সকল পশ্চিমে বিদ্যে। শেখবার আবশ্যক নেই বলে কে বিবাদ করেচে ? বিবাদ যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যার উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভাণ করার ওপর। শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের ওপর। এতকাল এই তামাসায় যোগ

দিয়ে পাগলের মত সবাই নেচে বেড়াচ্ছিল, এখন হঠাৎ জনকয়েক লোকের চৈতন্য হওয়ায় তারা পেছিয়ে দাঁড়িয়ে এই ফাঁকিটাকে কেবল আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেচে—এই ত দেখি আসলে মতভেদের কারণ।

এই বস্তুটাকেই একটু বিশদ করে দেখবার চেষ্টা করা যাক। পশ্চিমের পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময় এতখানি এইটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয়নি। মানুষ মারবার নব নব কৌশল এরা যত আবিষ্কার করেছে ততই আনন্দে দম্ভে এদের বুক ভ'রে উঠেচে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম সহরকে সহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বার করেছে এবং আরও কত বার করত এই যুদ্ধটা আরও কিছু দিন অগ্রসর হলে। সৌভাগ্য এবং সভ্যতার বোধ করি এদের এই একটিমাত্র মাপকাঠি কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটেই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। এ যে দেখতে না পায় সে অন্ধ এবং এই বিদ্যাটা অপরকে এরা শিখাতে পারে কিম্বা শেখাবার সুযোগ দিতে পারে অতি বড় কবি-কল্পনাতেও এ আমি ভাবতে পারি না। কথা উঠতে পারে মানবের কল্যাণকর এমন কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয় নি? হয়েছে বই কি। কিন্তু সে নিতান্তই by-product এর মত। বলা যেতে পারে, হ'ক by-product কিন্তু সে যখন মানবের হিতার্থে তখন সেই বিদ্যাগুলো আয়ত্ত করেও ত আমরা মানুষ হতে পারি? হয়ত পারি। কিন্তু ঠিক ও উপায়ে নয়। পশ্চিমের সভ্যতার অহঙ্কার অভ্রভেদী। আমাদের এবং আমাদের মত আরও অনেক দুর্ভাগা জাতির কাঁধে যখনই ওরা চেপে থাকে তখনই ঘরে বাইরে এই কৈফিয়ৎ দেয় যে এগুলো দেখতে শুনতে মানুষের মত হলেও ঠিক মানুষ নয়। অন্ততঃ সাবালক মানুষ নয়, ছেলেমানুষ।....

বস্তুতঃ, একথা বোঝা কি এতই কঠিন যে, বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু তারই আর কারও নয়,—পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? তার বিদ্যালয় তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্ব্বনাশের জন্যেই তৈরি করিয়ে দেবে? সে কেবল-মাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকীল মোক্তার মুনসেফ; হুকুম মত জেলে দিতে ডেপুটি সবডেপুটি; ধরে আনতে থানার ছোট বড় পিয়াদা; ইস্কুলে ভুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মাষ্টার; কলেজে ভারতের হীনতা ও বর্ব্বরতার লেকচার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, অফিসে খাতা লিখতে জীর্ণ শীর্ণ কেরাণী,—তার শিক্ষাবিধান এর বেশি দিতে পারে এও যে আশা করতে পারে সে যে পারে না কি আমি তাই শুধু ভাবি।....

....য়ুরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করিনে কিম্বা যে হাতী দঁকে পড়ে গেছে তাকে নিয়ে আস্ফালন করবার আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে ভূতের ওঝা ও মারণ-উচাটন মন্ত্রতন্ত্রের ইঙ্গিতও নির্ব্বিবাদে হজম করতে পারিনে! 'গোরা' বলে বাঙলা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে; কবি যদি একবার সেখানি পড়ে দেখেন ত দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন,—নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ, এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে!....

....পশ্চিম ও পূর্ব্বের শিক্ষার সংঘর্ষ ঠিক কোনখানে? এদের সত্য মিলনের যথার্থ অন্তরায় কোথায়? এ কি কেবল গোটাকতক সাজগোজ বদলালেই হবে? টেবিল চেয়ারের বদলে লম্বা লম্বা

মাদুর পেতে, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের পরিবর্ত্তে তালপাখা এনে, কিম্বা মোটা মাইনের প্রফেসারের বদলে রোগা মাইনের দিশি অধ্যাপক আমদানী করে কিম্বা বড় জোর বিদেশী ভাষার মিডিয়মের স্থানে স্বদেশী ভাষায় লেকচারের আইন করলেই দুঃখ দূর হবে? দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না যতক্ষণ না সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় যাতে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা কি, সে কেবল হতে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। এমন কাঙালের মত, ভিক্ষুকের মত কিছুতেই হবে না। হলেও সে শুধু একটা গোঁজামিল হবে,—তাতে কল্যাণ নেই, গৌরব নেই, দেশকে সে কেবল হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে, কোনদিন মনুষ্যত্ব দেবে না।....

....পশ্চিমের সভ্যতার আদর্শে মানুষ মারবার শত-কোটী যন্ত্র-তন্ত্র, পরের দেশেও তার মুখের গ্রাস অপহরণ করবার ততোধিক কলকারখানা, এ সমস্তই তার প্রয়োজনে তার নিজের মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করেচে,—কিন্তু ঠিক ওই সকল আর এক দেশের সভ্যতার আদর্শে প্রয়োজন কিনা আমি জানি না। কিন্তু কবি বলেছেন এই সকল মহৎ কার্য্য করেছে তারা নিশ্চয়ই কোন একটী সত্যের জোরে। অতএব ওটা আমাদের শেখা চাই, কারণ বিদ্যাটা তাদের সত্য। এবং পরক্ষণেই বলেছেন, কিন্তু শুধু ত বিদ্যা নয়, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানীও আছে, সুতরাং শয়তানীর যোগেই ওদের মরণ।

হতেও পারে। কিন্তু যে লোক মারণ-উচাটন বিদ্যে শিখে মন্ত্র জপতে সুরু করেচে, তার কোনটা সত্য আর কোনটা শয়তানী নির্ণয় করা কিছু কঠিন।....

....বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়; শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী—এ দুটো আলাদা জিনিষ। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জ্জন করা নয়। এমনও হতে পারে বিদ্যালয়

ছাড়াই বিদ্যালাভের বড় পথ। আপাতঃদৃষ্টিতে কথাটা উল্টো মনে হলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তেলে জলে মেশে না, এ ছুটো পদার্থও একেবারে উল্টো, তবু, তেলের সেজ জ্বালাতে যে মানুষ জল ঢালে সে কেবল তেলটাকেই নিঃশেষে পুড়িয়ে নিতে। যারা এ তত্ত্ব জানে না তাদের একটু ধৈর্য্য থাকা ভাল, এমন উতলা হয়ে নিন্দে করতে নেই।"

উত্তরকালে কালিদাস রায় মন্তব্য করেছেন: "দেশবন্ধু প্রবর্ত্তিত কংগ্রেসের মুখপত্র 'বাংলার কথা'য় শরৎচন্দ্র 'শিক্ষার বিরোধ' নামে প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথের অভিমতের বিরুদ্ধে এতেই শরৎচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম নিজের অভিমত প্রচার করেন।"

শরৎচন্দ্র, ১৯২১ সালের ২৪ ডিসেম্বর, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা বলো তো, আমাদের ভারতবর্ষের সকল কবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কী, অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ থেকে আরম্ভ করে শততম পর্যন্ত একশ স্থানের মধ্যে কোন স্থানটি তিনি অধিকার করে আছেন?

খানিকক্ষণ চিন্তা করে উপেন্দ্রনাথ বললেন—ঠিক করতে পারছি নে। তুমি যখন প্রশ্নকর্তা, তখন উত্তরও তুমি নিশ্চয় জানো। তুমিই বলো, রবীন্দ্রনাথের স্থান কী?

শরৎচন্দ্র বললেন—দ্বিতীয়। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ যদি দ্বিতীয় হন, তাহলে প্রথম কে তা বলো?

—এ-প্রশ্ন আরও কঠিন ঠেকছে। এর উত্তরও তুমিই দাও।

শরৎচন্দ্র বললেন—প্রথম বেদব্যাস।

—বাল্মীকি?

শরৎচন্দ্র বললেন—অনেক নীচে, অনেক নীচে। এঁদের ছুজনের অনেক নীচে।

—কালিদাস?

শরৎচন্দ্র বললেন—কালিদাসও অনেক নীচে। প্রথম থেকে

দ্বিতীয়ের যে দূরত্ব, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়ের দূরত্ব তার কয়েকগুণ বেশী।

এই বৃত্তান্ত দাখিল করে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "মনে মনে একটা দর্প ছিল, আমার মত রবীন্দ্র-ভক্ত খুব বেশি সুলভ নয় ; আমার পাশে শরৎচন্দ্রের পরিচয় পেয়ে বেশ খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেলাম।"

'সত্য ও মিথ্যা' নামে শরৎচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'বাঙ্গলার কথা'য়—১৯২২ সালের ৩ ফেব্রুআরি (পৃঃ ১৩৮) ; ১৯২২ সালের ১৭ ফেব্রুআরি (পৃঃ ১৫১-৫২) ; প্রবন্ধটি থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধার করি :

"সেদিন University Instituteএ কবিতা আবৃত্তির ছেলেদের মধ্যে একটা প্রতিযোগীতার পরীক্ষা ছিল। সর্ব্বদেশ পূজিত কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "এবার ফিরাও মোরে" শীর্ষক কবিতাটি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। যাহারা পরীক্ষা দিবে তাহাদেরই একজন আমার কাছে দুই একটা কথা জানিয়া লইতে আসিয়াছিল। তাহারই কাছে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম যে এই সুদীর্ঘ কবিতাটির যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ,—এই দুর্ভাগা দেশের দুর্দ্দশার কাহিনী যেথায় বিবৃত—সেই অংশগুলিই বাছিয়া বাছিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কুকার্য্য কে করিল।

ছেলেটি কহিল, আজ্ঞে, নির্ব্বাচনের ভার যাঁহাদের উপর ছিল তাঁহারা।

মনে করিলাম, রত্ন ইঁহারা চিনেন না, তাই, এও বুঝি সেই ছোবড়া আঁটির ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু ছেলেটি দেখিলাম সব জানে, সে আমার ভুল ভাঙ্গিয়া দিল। সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে তাঁরা সমস্তই জানেন, তবে কিনা ওতে দেশের দুঃখ-দৈন্যের কথা আছে তাই ওটা আবৃত্তি করা যায় না—ওটা সিডিশন্।

কহিলাম কে বলিল ?

ছেলেটি জবাব দিল আমাদের কর্ত্তৃপক্ষরা।

যাক্,—বাঁচা গেল। কর্ত্তৃপক্ষ এদিকেও আছেন। অর্ব্বাচীন শিশুগুলার মঙ্গল চিন্তা করিতে এ পক্ষেও পাকা মাথার অভাব ঘটে নাই। প্রশ্ন করিলাম আচ্ছা, তোমরা এই কবিতাংশগুলি সভায় আবৃত্তি করিতে পার না?

সে কহিল, পারি, কিন্তু তাঁরা বলেন পারা উচিত নয়, ফ্যাসাদ বাধিতে পারে।

আর প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। দেশের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, যিনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল,—স্বদেশের হিতার্থে যে কবিতা তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত হইয়াছে প্রকাশ্য সভায় তাঁহার আবৃত্তি সিডিশন্,—তাহা অপরাধের। এবং এই সত্য দেশের ছেলেরা আজ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে। এবং কর্ত্তৃপক্ষের অকাট্য যুক্তি এই যে, ফ্যাসাদ বাধিতে পারে!"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিন্দাও করেছেন শরৎচন্দ্র। কথাটা রবীন্দ্রনাথের কানে গিয়েছে। এবং শোনা গেল, তিনি শরৎচন্দ্রের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

শরৎচন্দ্র, ১৯২২ সালের ৯মে, রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

"আপনার কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু এই প্রথম বলিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আপনি ছাড়া আর কোন বড়লোকের বাড়ীতে আমি ইচ্ছা করিয়া কোনদিন যাই না, আমার সে পথটাও নিজের দোষে বন্ধ হইয়াছে মনে হইলে ভারি দুঃখ হয়।

আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে আমিও একজন ; তাহাদের মত এত কাল আমিও কখনো আপনার নিন্দা করিতে যাই নাই, কিন্তু এবার কেন যে আমার এরূপ দুর্বুদ্ধি হইল জানি না।"

শিবপুর ইনষ্টিটিউটের সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৩ সালের ১ জুলাই, উপস্থিত থেকেছেন। সেদিন শরৎচন্দ্র বলেছেন : "সমস্ত

বিশ্বের বরণীয় কবি আজ আমাদের সভাপতি। অনেক কষ্টে তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়াছি ; শুধু কেবল তাঁহাকে মাঝখানে পাইবার লোভেই নয়,—এই সভাপতি লইয়া অনেক ক্ষেত্রে অনেকেরই মর্ম্মপীড়ার কারণ ঘটে। আমরা তাই স্থির করিয়াছিলাম যে, এমন এক ব্যক্তিকে আনিয়া হাজির করিব যাঁহার সর্ব্বোচ্চ স্থানটি লইয়া তর্ক না থাকে,—এই আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে মর্ম্মদাহের যেন আর লেশমাত্র অবকাশ না ঘটে।"

রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৬ সালের ১৬ এপ্রিল, দিলীপকুমার রায়কে লিখেছেন : "এই মাত্র কোনো পত্র লেখক আমাকে জানিয়েছেন যে, শরতের বিশ্বাস আমি তাঁর উপর বিরক্ত। যাঁরা আমাকে ভালো রকম জানেন তাঁরা এত বড় ভুল করতেই পারেন না।.... শরৎ আমার সম্বন্ধে কোনো অপরাধই করে নি—বোধ করি তুমি জানো, শরৎ সম্বন্ধে আমি কখনই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নে (সাহিত্য সম্বন্ধে), প্রথম থেকেই আমি তাঁকে প্রশংসাই করে এসেছি। অনেকে গল্প রচনা সম্বন্ধে শরৎকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে থাকে তাতে আমার ভাবনার কারণ এই জন্যে নেই যে, কাব্য রচনা সম্বন্ধে আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেকথা অতি বড় নিন্দুকও অস্বীকার করতে পারবে না। ভাবীকালের লোকের কাছে নিজের স্থায়ী পরিচয়ের দলিল রেখে যাওয়া যদি লোভনীয় হয় তা হলে কোনো একটা মাত্র পাকা দলিলই কি যথেষ্ট নয়?....ভাবীকালের দখল সম্বন্ধে আমার যদি কোনো দলিল না থাকত, এ সংসারে আমার সকল অধিকারই যদি কেবল জীবনস্বত্ব মাত্র হত তা হলেও আমি বলতুম, শরৎ চাটুয্যে না হয় ভালো গল্প লিখতেই পারেন, আমি পারি নে বলে সে গল্প আমার ভালোও লাগবে না এত বড় বোকামি যে আমার নেই সে আমার কম গৌরবের কথা নয়। ...শরতের এককালীন চরকা ভক্তি নিয়ে আমি তোমাদের কাছে বারবার হেসেছি, কখনো হাসতুম না, গম্ভীর হয়ে নীরব হয়ে থাকতুম যদি

আমার মনের মধ্যে লেশমাত্র কাঁটার ক্ষত থাকত। কারণ ব্যক্তিগত কারণে যার উপরে আমার বিমুখতা আছে তাকে নিন্দা করতে আমি ভারি লজ্জাবোধ করি। যাকে প্রশংসা করতে পারি নে তাকে আমি নিন্দাও করতে নারাজ।···· শরৎ শুনেছি নিজের আইনে নিজেকে কোন দ্বীপান্তরে চালান করে দিয়ে নিঃসঙ্গ বন্দী-ব্রত গ্রহণ করে বসে আছেন। তাঁর ঠিকানা জানি নে, তুমি নিশ্চয়ই জানো, অতএব তাঁকে মোকাবিলায় বা ডাকযোগে জানিয়ো যে সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাঁর কল্যাণ কামনা করি। তিনি চরকা ছেড়ে কলম ধরেছেন তাতে আমি খুসি হয়েছি এই জন্যে যে, তাঁর কলম থেকে দেশোন্নতির যে সূত্রপাত হবে চরকা থেকে তা হবে না—কিন্তু খেয়ালের বশে যদি তিনি চক্রধর হয়েই থাকেন তা হলেও তাঁর বিরুদ্ধে আমি কখনোই চক্রান্ত করব না।····"

এই চিঠিখানা প্রকাশিত হয়েছে 'কল্লোল' পত্রিকায়—১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠে।

এই চিঠিখানার সূত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছেন: "অকস্মাৎ কে যে কবিকে আমার কথা লিখে জানিয়েছে ঠাউরে পেলাম না, কিন্তু কথাটা আমি বলেছি তা সত্য। আমার ধারণা ছিল তিনি আমার প্রতি বিরক্ত···। যাই হোক এখন নিশ্চয়ই জানলাম ধারণা আমার ভুল। মস্ত স্বস্তি।"

'পথের দাবী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার কিছুকাল আগের কথা। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু একদিন শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—রবিবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয় না?

শরৎচন্দ্র বললেন—আগে মাঝে মাঝে হত, এখন আর বিশেষ হয় না। তিনি থাকেন ওদিকে, আমি থাকি এদিকে।

রবীন্দ্রনাথকে কম গালমন্দ সহ্য করতে হয়নি। এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্র সেদিন সত্যেন্দ্রপ্রসাদকে বললেন—সে আর বলতে! সে-বিষয়ে তাঁর তুলনায় আমি শিশু বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের

হাতে তিনি যে লাঞ্ছনা, যে অবমাননা পেয়েছেন সেকথা স্মরণ হলে দুঃখে এবং লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'মার খেলে তার আঘাত কি লাগে না শরৎ? কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায় কি?'—দেখেছ, কি কালচার, কি শিক্ষাদীক্ষা, কি অসাধারণ সহিষ্ণুতা! কোনোদিন মুখ খুলে এতটুকু প্রতিবাদ করেন নি। ঋষিতুল্য মহাপুরুষ তিনি, সৌম্য শান্তমুখে নীরবে সব সহ্য করেছেন। তাঁর মত ধৈর্য কি আমার আছে?···এক একবার ইচ্ছে করে, এইরকম অযথা maliciously যারা তাঁকে নিন্দা করে, তাদের প্রতিবাদ করে খুব করে একবার চুটিয়ে লিখে দিই। উনি নেহাত ভালোমানুষ, ওঁর দ্বারা তো এ-কাজ হবে না। আমি মুখ্যুসুখ্যু পাড়াগাঁয়ের লোক, সব কথা খোলাখুলিভাবে সোজা কাঠখোট্টা রকমে বলতে পারব।

দেশের লোকের হাতে রবীন্দ্রনাথের লাঞ্ছনার কথা বলতে বলতে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠলেন, তাঁর মুখে পরম দুঃখের ছায়া ঘনিয়ে এল। উত্তেজিত হয়ে তিনি বলে উঠলেন—অথচ যাঁরা তাঁকে অযথা নিন্দা করতেন তাঁদের জন্য সাহিত্যসমাজে তাঁদের সুপরিচিত করবার জন্য তিনি কত না চেষ্টা করেছেন!····

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সেদিন শরৎচন্দ্রের মুখে অনেক কথা শুনতে পেয়েছেন:

"দুর্ভাগ্য আমাদের যে, এত বড় কবিকে আমরা চিনতে পারলুম না। পশ্চিমের লোকেরা অনুবাদের মধ্য দিয়ে কি ছাই পেয়েচে, তাঁর প্রতিভার দশ ভাগের এক ভাগেরও পরিচয় তারা পায় নি। তবু তারা যেটুকু ওঁকে বুঝেচে আমরা তাও বুঝি নি। এত বড় কবি আমাদের দেশে আর হয় নি।

মানুষের হৃদয়ের যতরকম অনুভূতি থাকতে পারে তার কি আশ্চর্য্য প্রকাশ হয়েছে তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে! সৌন্দর্য্যের কি একটা অবিরাম বিচিত্র জীবনব্যাপী প্রবাহ!

—এই ত ৬৫ বছর বয়স হ'ল, আমাদের কপালে আর কত দিনই বা টিঁকে থাকবেন ? তবু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,—আমাদের এই পরাধীন দেশে সাহিত্য ছাড়া গর্ব্ব করবার আর কি আছে ? আর কিছু চাই নে ওঁর কাছে, আরো কয়েকটা বছর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন। যেদিন তিনি থাকবেন না, সেদিন যে আমাদের কত বড় দুর্দ্দিন তা ভাবতেও ভয় হয়।....

দেখতে পাচ্চ না, সাহিত্যের ধারাটা কেমন বদলে দিয়েছেন। আমায় একদিন বলছিলেন, 'কি বল শরৎ তুমি, আমি জানি আমার কবিতার দু'শ পাঠকও নেই।' আমি বল্লুম, 'কি যে বলেন, আজকাল এমন একটা কবিতা আপনি দেখতে পান যার মধ্যে আপনার প্রভাব নেই ? আমি অনুকরণ বলব না, কিন্তু কাব্যের যে ধারা বইয়ে দিয়েচেন সেই ধারা অনুসরণ করে পরবর্ত্তী সমস্ত কবিরা চলেচেন।'—আর শুধু কবিতার কথাই বলি কেন ? উপন্যাসের ক্ষেত্র, ভাষায়ও কি তিনি সেই কাজ করেন নি ? আজকাল কি কেউ বঙ্কিম বাবুর ভাষায় লেখে বা সেইরকম উপন্যাস রচনা করে ?

—হাওড়া কি অন্য কোথায় ঠিক মনে নেই, একটা ছোট মতন সাহিত্য সম্মিলনে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যা লেখেন তা বুঝতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না, আর বেশ ভালোও লাগে ; কিন্তু রবিবাবুর লেখা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না,—কি যে তিনি লেখেন তা তিনিই জানেন।'—ভদ্রলোকটি ভেবেছিলেন তাঁর এই কথা শুনে নিজেকে অহঙ্কৃত মনে করে আমি খুব খুশি হব। আমি উত্তর দিলুম, 'রবিবাবুর লেখা তোমাদের ত বুঝবার কথা নয়। তিনি ত তোমাদের জন্যে লেখেন না। আমার মত যারা গ্রন্থকার তাদের জন্যে রবিবাবু লেখেন, তোমার মত যারা পাঠক তাদের জন্যে আমি লিখি'।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শরৎচন্দ্র বললেন—তাঁর কথা বলো না—তিনি আমার গুরু, আমার গুরু।

শরৎচন্দ্র বহুদিন গিরিজাকুমার বসুকে বলেছেন—রবীন্দ্রনাথকে খাটো করে আমাকে খুশি করতে চায় যারা, তাদের আক্কেল দেওয়া যায় কী করে বলো তো?

শরৎচন্দ্র একটি বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখে মুগ্ধ হয়ে, ১৯২৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর, লিখেছেন: "অনেক দিন পরে সেদিন বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কি আশ্চর্য্য সুন্দর,—চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়—সৌন্দর্য্য। জগতে এত বড় বিস্ময় জানি না।"

'সাহিত্য-ধর্ম্ম' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'বিচিত্রা'য়—১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে (পৃঃ ১৭১-৭৫)। প্রবন্ধটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি:

"কোটালের পুত্র, সওদাগরের পুত্র, রাজপুত্র এই তিন জনে বাহির হন রাজকন্যার সন্ধানে। বস্তুতঃ রাজকন্যা বলে যে একটি সত্য আছে তিন রকমের বুদ্ধি তাকে তিন পথে সন্ধান করে।

কোটালের পুত্রের ডিটেক্‌টিভ্‌-বুদ্ধি, সে কেবল জেরা করে। কর্‌তে কর্‌তে কন্যার নাড়ীনক্ষত্র ধরা পড়ে; তার রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণের ভিতর থেকে মনস্তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বের এলেকায় তিনি পৃথিবীর সকল কন্যারই সমান দরের মানুষ—ঘুঁটেকুড়োনীর সঙ্গে তাঁর প্রভেদ নেই। এখানে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁকে যে-চক্ষে দেখেন সে-চক্ষে রসবোধ নেই, আছে কেবল প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা।

আর একদিকে রাজকন্যা কাজের মানুষ। তিনি রাঁধেন বাড়েন, সূতো কাটেন, ফুলকাটা কাপড় বোনেন। এখানে সওদাগরের পুত্র তাঁকে যে চক্ষে দেখেন সে চক্ষে না আছে রস, না আছে প্রশ্ন; আছে অর্থের হিসাব।

রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন—অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি—

তিনি উত্তীর্ণ হয়েচেন, বোধ করি, চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার হয়েচেন জ্ঞানের জন্যে না, ধনের জন্যে না, রাজকন্যারই জন্যে। এই রাজকন্যার স্থান ল্যাবরেটরিতে নয়, হাটবাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে, যেখানে কাব্যের কল্পলতায় ফুল ধরে। যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারি প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ, কোনো সমজদার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, "তুমি কেন?" সে বলে, "তুমি যে তুমিই, এই আমার যথেষ্ট।" রাজপুত্রও রাজকন্যার কানে-কানে এই কথাই বলেছিলেন। এই কথাটা বল্‌বার জন্যে সাজাহানকে তাজমহল বানাতে হয়েছিল।

যাকে সীমায় বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞা নির্ণয় চলে; কিন্তু যা সীমার বাইরে, যাকে ধ'রে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাইনে, বোধের মধ্যে পাই। উপনিষদ্ ব্রহ্মসম্বন্ধে বলেচেন, তাঁকে না পাই মনে, না পাই বচনে, তাঁকে যখন পাই আনন্দবোধে, তখন আর ভাবনা থাকে না। আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রেমে, যে-ধ্যানে, যে-দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপকলায়।......

যে-মন বরণীয়কে বরণ করে নেয় তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই। সজ্‌নেফুলে সৌন্দর্য্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজ্‌নেফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য এই খর্ব্বতায় কবির কাছেও সজ্‌নে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারালো। বকফুল, বেগুনের ফুল, কুম্‌ড়ো ফুল এই সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে, রান্নাঘর ওদের জাত মেরেচে। কবির কথা ছেড়ে দাও, কবির সীমন্তিনীও অলকে

সজ্‌নে-মঞ্জরী পর্‌তে দ্বিধা করেন, বকফুলের মালায় তাঁর বেণী জড়ালে ক্ষতি হ'ত না, কিন্তু সে কথাটা মনেও আমল পায় না। কুন্দ আছে, টগর আছে, তাদেরও গন্ধ নেই, তবু অলঙ্কার মহলে তাদের দ্বার খোলা—কেননা পেটের ক্ষুধা তাদের গায়ে হাত দেয় নি। বিম্ব যদি ঝোলে-ডাল্‌নায় লাগ্‌ত তাহ'লে সুন্দরীর অধরের সঙ্গে তার উপমা অগ্রাহ্য হ'ত। তিসিফুল শর্ষেফুলের রূপের ঐশ্বর্য্য প্রচুর, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরম গতি বলেই কবিকল্পনা তাদের নম্র নমস্কারের প্রতিদান দিতে চায় না। শিরীষফুলের সঙ্গে গোলাপজামফুলের রূপে-গুণে ভেদ নেই, তবু কাব্যের পংক্তিতে ওর কৌলীন্য গেল, কেননা গোলাপজাম নামটা ভোজন-লোভের দ্বারা লাঞ্ছিত। যে-কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাত বিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের এক-শ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বুবনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনাভার নিল। কাব্যে সৌভাগ্যক্রমে কোনো শুভক্ষণে রসজ্ঞ দেবতাদের বিচারে মদনের তূণে আমের মুকুল স্থান পেয়েছে। বোধ করি অমৃতে অনটন ঘটে না বলেই আমের প্রতি দেবতাদের আহারে লোভ নেই। স্বচ্ছ জলের তলে রুইমাছের সন্তরণলীলা আকাশে পাখী ওড়ার চেয়ে কম সুন্দর নয়, কিন্তু রুইমাছের নাম করবামাত্র পাঠকের রসবোধ পাছে নিঃশেষে রসনার দিকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এই ভয়ে ছন্দোবন্ধনে বেঁধে ওকে কাব্যের তীরে উত্তীর্ণ করা দুঃসাধ্য হ'ল। সকল ব্যবহারের অতীত ব'লেই মকর বেঁচে গেছে—ওকে বাহনভুক্ত ক'রে নিতে দেবী জাহ্নবীর গৌরবহানি হ'ল না, নির্ব্বাচনের সময় রুই কাৎলাটার নাম মুখে বেধে গেল। তার পিঠে স্থানাভাব বা পাপ্‌ড়িতে জোর কম ব'লেই এমনটা ঘটেছে তা'তো মান্‌তে পারিনে। কেননা লক্ষ্মী সরস্বতী যখন পদ্মকে আসন ব'লে বেছে নিলেন তার দৌর্ব্বল্য বা অপ্রশস্ততার কথা চিন্তাও করেন নি।........

যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে, তা "প্রজনার্থং" নয়, কেননা সেখানে সে পশু ; সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ। তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম্ম উভয়ের সীমানা-বিভাগ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাধে। সাহিত্যে আপন পুরো খাজ্‌না আদায়ের দাবী ক'রে পশুর হাত মানুষের হাত উভয়ে একসঙ্গেই অগ্রসর হয়ে আসে। আধুনিক সাহিত্যে এই নিয়ে দেওয়ানি ফৌজদারী মাম্‌লা চল্‌চেই।

উপরে যে পশু-শব্দটা ব্যবহার করেচি এটা নৈতিক ভালমন্দ বিচারের দিক থেকে নয় ; মানুষের আত্মবোধের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে। বংশরক্ষাঘটিত-পশুধর্ম্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু সে হ'ল বিজ্ঞানের কথা—মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু রসবোধ নিয়ে যে-সাহিত্য ও কলা, সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না।....

বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাববর্জ্জিত—তার ধর্ম্মই হচ্চে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরচে। অথচ সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্চে তার পক্ষপাতধর্ম্ম—সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বরা। বিজ্ঞানের নির্ব্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের সেই বরণ-ক'রে-নেবার স্বভাবকে পরাস্ত করতে উদ্যত। আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌন-মিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব-যে একটা উপদ্রব চল্‌চে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্‌টোরেশন্‌ যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটীকা চিরদিনের মতো পায়নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিঁক্‌তে পারে না।....

সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করচেন

নিত্যপদার্থ ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখানকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বল্‌চে, ঐ আব্রুটাই দৌর্ব্বল্য, নির্ব্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাঙট্‌-পরা গুলি-পাকানো ধূলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই, পিচ্‌কারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে রাস্তার ধূলোকে পাঁক ক'রে তুলে তাই চিৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগ্‌লামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য করেচে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙীন্ করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না এমন কথা বলি নে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্য্য-কারণ বহুযত্নে বিচার্য্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্ব্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসঙ্গত ব'লেই আপত্তি করব, অসত্য ব'লে নয়।

সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষসমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যেব মধ্যে এর স্থান নেই কি? এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাৎলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত গর্জ্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে তখন আর্ত্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কিনা, যথার্থ প্রশ্ন হচ্চে এটা সঙ্গীত কিনা। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে একরকম উল্লাস হয়, কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব-একটা জোরও আছে। মাধুর্য্যহীন সেই রূঢ়তাকেই

যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মান্‌তে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাতুরী দিতে হবে সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্যকলার নয়।

উপসংহারে এ-কথাও বলা দরকার যে, সম্প্রতি যে-দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি তুঃশাসন-মূর্ত্তি ধ'রে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি কর্‌চে, সে-দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি, সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্ল্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে ?...."

'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' নামে সজনীকান্ত দাসের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'তে—১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে (পৃঃ ১—৯)। প্রবন্ধটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি ঃ

"গত ২৪শে মাঘ তারিখে আমার শ্রদ্ধাভাজন কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের সহিত আমি শরৎবাবুর রূপনারায়ণ নদীতীরস্থ গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। নানা কথাবার্ত্তার পর মোহিতবাবু বাঙলা সাহিত্যে বর্ত্তমান তুর্নীতি বিষয়ক একটি চমৎকার প্রবন্ধ সেখানে পাঠ করেন। শরৎবাবু প্রবন্ধটি অবিলম্বে কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করিতে বলিয়া বলেন যে, বাঙলা সাহিত্যে যে জঘন্যতা প্রকাশ পাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন আবশ্যক। 'কল্লোল', 'কালিকলম', শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন ও কাজি নজরুল ইস্‌লাম সম্বন্ধে কথা হয়। শরৎবাবু এই সকল পত্রিকার ও লেখকদের রুচি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিলে তিনি এ বিষয়ে নিজেই লিখিতেন। তিনি বলিলেন, শিক্ষাদীক্ষাহীন অর্ব্বাচীন ছেলেরা সাহিত্যের আবহাওয়া দূষিত করিলে সহ্য করা যায়, নজরুল ইস্‌লামের অশিক্ষিতপটুত্ব

তাঁহাকে কোনো বন্ধনের মধ্যে রাখিতে পারে না, কিন্তু নরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মত পণ্ডিতজন যখন এই পঙ্কিলতার সৃষ্টি করেন তখনই তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে সাধারণের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, তিনি ভুঁইফোঁড় লেখক, কোনো দিন কোনো বিষয়ে পড়াশুনা করেন নাই, এমন কি তিনি ইংরেজী পর্য্যন্ত ভাল জানেন না। সেইজন্য এই সকল স্বভাব-সাহিত্যিকদল তাঁহাকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া থাকে।

তিনি পরিহাস করিয়া বলিলেন, বিদ্যালয়গত শিক্ষা না থাকিলেও রেঙ্গুনে অবস্থানকালে সেখানকার লাইব্রেবীতে এমন কোনো ইংরেজী বাঙলা পুস্তক ছিল না যাহা তিনি পাঠ করেন নাই। পতিত ও পতিতাদের সম্বন্ধে তিনি তাঁহার লেখায় যে সহৃদয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়াই এই অভিনব দুর্নীতিসমর্থক সাহিত্যিকমণ্ডলী তাঁহাকে নিজেদের দলে টানিয়া থাকে। "কিন্তু", তিনি বিশেষ জোরের সহিত বলিলেন, "আমি আজ পর্য্যন্ত যা কিছু লিখেছি তার প্রত্যেকটি কথা ওজন ক'রে লিখেছি, আমি কখনো ফাঁকি দিয়ে লিখি না, আমার কোনো লেখায় একটি কথাও আমি অযথা লিখি না—একটি কথাও বদলাতে পারি না। আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, আমি পাপের বিকৃত জঘন্যরূপ দেখাবার জন্যেই পাপচিত্র এঁকেছি, সাহিত্যের রুচির বা নীতির কোনো আইন কখনো অমান্য করিনি। হয়ত কোনো কোনো জায়গায় আর-এক পা বাড়ালেই সেটা দুর্নীতিমূলক সাহিত্য হ'য়ে পড়ত, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি কোথায়ও সেই সীমা লঙ্ঘন ক'রে যাইনি।" দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পথের দাবী'তে যেখানে ভারতীর সঙ্গে থাকিয়া অপূর্ব্ব কুলীদের আড্ডার জঘন্যতা দেখিয়া লজ্জায় শিহরিয়া উঠিতেছে কিম্বা 'চরিত্রহীনে' সাবিত্রী যেখানে মোক্ষদার গৃহে সতীশকে শায়িত মনে করিয়া লজ্জায় মাটিতে মিশাইতে চাহিতেছে—এই দুইটি জায়গার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "এর বেশী

একচুল যাবার জো ছিল না—তাহ'লেই আমি সৎসাহিত্যকে ক্ষুণ্ণ করতুম।”

তিনি ‘বামুনের মেয়ে’ লিখিবার পূর্ব্বে বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট পরামর্শ চাহেন। এই বই লিখিলে ব্রাহ্মণ-সমাজে যে বিষম আন্দোলন উঠিতে পারে তাহার উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন– “তুমি কি পারবে?” শরৎচন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন—“আমাকে যা বলবেন তাই লিখতে পারব কেবল অশ্লীল কিছু আমার কলমে বেরুবে না। তাছাড়া আর সব পারব।”

অন্যান্য আরো অনেক কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমাদের এই ধারণা হয় যে, আগাছাক্লিষ্ট বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের দুর্দ্দশায় শরৎচন্দ্র নিতান্তই ব্যথিত আছেন। সাহিত্য সাধনার সামগ্রী, সেই সাহিত্যকে লইয়া এ ভাবে নাস্তানাবুদ করাকে তিনি দেশের পক্ষে অত্যন্ত কুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহার মতে, কলঙ্কিত বিষাক্ত সাহিত্য সৃষ্টি অপেক্ষা, সাহিত্য একেবারে লুপ্ত হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়।....”

‘সাহিত্যের রীতি ও নীতি’ নামে শরৎচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ‘বঙ্গবাণী’তে—১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে (পৃঃ ২৩৭-৪৬)। প্রবন্ধটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি :

“শ্রাবণ মাসের “বিচিত্রা” পত্রিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম্ম নিরুপণ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী সংখ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত উক্ত ধর্ম্মের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া একান্ত শ্রদ্ধাভরে কবির উদাহরণগুলিকে রূপক এবং যুক্তিগুলিকে সবিনয়ে রসরচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উভয়ের মত-দ্বৈধ ঘটিয়াছে প্রধানতঃ আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতা লইয়া।

ইতিমধ্যে বিনা দোষে আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধদলের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত "শনিবারের চিঠি"তে আমার মতামত এম্‌নি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন যে ঢোক গিলিয়া, মাথা চুল্‌কাইয়া হাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া পিছ্‌লাইয়া পলাইবার আর পথ রাখেন নাই। একেবারে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

এদিকে বিপদ হইয়াছে এই যে, কালক্রমে আমারও দুই চারিজন ভক্ত জুটিয়াছে; তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে, তুমিই কোন্ কম্? দাওনা তোমার অভিমত প্রচার করিয়া।

আমি বলি, সে যেন দিলাম, কিন্তু তার পরে? নিজে যে ঠিক কোন্ দলে আছি তাহা নিজেই জানি না, তাছাড়া এদিকে নরেশবাবু আছেন যে! তিনি শুধু মস্ত পণ্ডিত নহেন, মস্ত উকিল। তাঁর যে-জেরার পরাক্রমে কবির যুক্তি-তর্ক রস-রচনা হইয়া গেল, সে-জেরার প্যাঁচে পড়িলে আমি ত একদণ্ডও বাঁচিব না। কবি তবুও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তির কোঠায় পৌঁছিয়াছেন, আমি হয়ত ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি কোনটারই নাগাল পাইব না, ত্রিশঙ্কুর ন্যায় শূন্যে ঝুলিয়া থাকিব! তখন?

ভক্তরা বলে, আপনি ভীরু।

আমি বলি, না।

তাহারা বলে, তবে প্রমাণ করুন।

আমি বলি, প্রমাণ করা কি সহজ ব্যাপার। 'রস-সৃষ্টি' 'রসোদ্বোধন' প্রভৃতির রস-বস্তুটির মত ধোঁয়াটে বস্তু সংসারে আর আছে না কি? এ কেবল রসরচনার দ্বারাই প্রমাণিত করা যায়,—কিন্তু সে সময় আপাততঃ আমার হাতে নাই।

এ ত গেল আমার দিকের কথা। ও-দিকের কথাটা ঠিক জানি না কিন্তু অনুমান করিতে পারি।

প্রিয়-পাত্ররা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, মশাই আমরা ত আর পারিয়া উঠি না, এবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না না, ধনুর্বাণ নয়,

ধনুর্বাণ নয়,—গদা ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক-পল্লীর দিকে। লক্ষ্য? কোন প্রয়োজন নাই। ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে।

কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে ঈপ্সিত লাভ না হৌক শব্দ এবং ধূলা উঠিয়াছে প্রচুর। নরেশচন্দ্র চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, এবং বিনীত-ক্রুদ্ধকণ্ঠে বারম্বার প্রশ্ন করিতেছেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন? কেন করিয়াছেন বলুন? হাঁ কি না বলুন?

কিন্তু এ প্রশ্নই অবৈধ। কারণ, কবি ত থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচি-ধর্ম্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশী-ধারী অশুচি-ধর্ম্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালিকলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি কবে কোন্ মহীয়সী জননী অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকাগৃহেই সন্তান বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এ সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময় ধৈর্য্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক-আধটা টুক্‌রো টাক্‌রা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেও তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুইই গিয়াছে। সুরু হইয়াছে চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত গর্জ্জন। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।

ভক্ত-বাক্যের মত প্রামাণ্য সাক্ষ্য আর কি আছে? অতএব, তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিয়াছে আধুনিক সাহিত্যে কেবল সত্যের

নাম দিয়া নর-নারীর যৌন মিলনের শারীর ব্যাপারটাকেই অলঙ্কৃত করা চলিয়াছে। তাহাতে লজ্জা নাই, সরম নাই, শ্রী নাই, সৌন্দর্য্য নাই, রস-বোধের বাষ্প নাই,—আছে শুধু ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিস্। অথচ, যে-কোন সাহিত্যিককেই যদি তিনি ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ত শুনিতে পাইতেন তাহারা প্রত্যেকেই জানে যে সত্য মাত্রই সাহিত্য হয় না। জগতে এমন অনেক নোঙ্‌রা সত্য ঘটনা আছে যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোনমতেই সাহিত্য রচনা করা চলে না।

কাবর হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে যে, সজিনা, বক, কুমড়ো প্রভৃতি কয়েকটা ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই। গোলাপজাম-ফুলও না, যদিচ সে, শিরীষফুলের সর্ব্ববিষয়েই সমতুল্য। কারণ? না, সেগুলা মানুষে খায়। রান্নাঘর তাহাদের জাত মারিয়াছে। তাই উদাহরণের জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন গঙ্গাদেবীর মকরের কাছে। অথচ, হাতের কাছে বাগ্দেবীর বাহন হাঁস খাইয়া যে মানুষে উজাড় করিয়া দিল সে তাঁহার চোখে পড়িল না। কুমুদ ফুলের বীজ হইতে ভেটের খৈ হয়, এমন যে পদ্ম তাহারও বীজ লোকে ভাজিয়া খাইতে ছাড়ে না। তিল ফুলের সহিত নাসিকার, কদলী বৃক্ষের সহিত সুন্দরীর জানুর উপমা কাব্যে বিরল নহে। অথচ, সুপক্ক মর্ত্তমান রম্ভার প্রতি বিতৃষ্ণার অপবাদ কোন কবির বিরুদ্ধেই শুনি নাই। আজ নরেশচন্দ্র বৃথাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে গিয়াছেন যে, বিল্বফল অনেকে তরকারি রাঁধিয়া খায়। উত্তরে কবি কি বলিবেন জানি না, কিন্তু তাঁহার ভক্তরা হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিবেন, খাওয়া অন্যায়। যে খায় সে সৎ-সাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধিবশতই এরূপ করে।

কিন্তু এই লইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিরর্থক। এগুলা যুক্তিও নয়, তর্কও নয়, কোন কাজেও লাগে না। অথচ, এই ধরণের গোটা কয়েক এলো-মেলো দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া কবি চিরদিনই

জোর করিয়া বলেন, এর পরে আর সন্দেহই থাক্‌তে পারে না যে আমি যা বল্‌চি তাই ঠিক এবং তুমি যা বোল্‌চ সেটা ভুল।····

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রস-বস্তু লইয়া আমি আলোচনা করিতে পারিব না। কারণ, ও আমি জানি না। রসিক-অরসিকের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেও আমি অপারক। কবির বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধা ঠিক যে কি এবং কিসে মেটে সে আমার অনধিগম্য। কিন্তু একটা কথা জানি যে কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য একবস্তু নয়। আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্য ত নয়ই। সোনার তরীর যা লইয়া চলে চোখের বালির তাহাতে কুলায় না। সজিনা ফুলে বক ফুলে সোনার তরীর প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সেগুলা না হইলেই নয়। তেপান্তর মাঠ এবং পক্ষীরাজ ঘোড়া লইয়া কাব্যের চলে, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের চলে না। এখানে ঘোড়ার চার পায়ে ছুটিতে হয়, পক্ষবিস্তার করিয়া উড়ার সুবিধা হয় না।····

····বিজ্ঞানের প্রতি কবির হয়ত একটা স্বাভাবিক বিমুখতা আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বলিতে যে কি বুঝায় আমি বুঝিলাম না। বিজ্ঞান বলিতে যদি শুধু Sex-Psychology, Anatomy অথবা Gynæcology বুঝাইত তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যে ইহার অবারিত প্রবেশে আমিও বাধা দিতাম। কেবল অবাঞ্ছিত বলিয়া নয়, অহেতুক ও অসঙ্গত বলিয়া আপত্তি করিতাম। পৃথিবী সূর্য্যের চারিপাশে ঘোরে ইহা যতবড় কথাই হৌক সাহিত্যের মন্দিরে ইহার প্রয়োজন গৌণ, কিন্তু যে সুবিন্যস্ত, সংযত চিন্তাধারার ফল এই জিনিষটি, সে চিন্তা নহিলে কাব্যের চলে চলুক উপন্যাসের চলে না। বিজ্ঞান ত কেবল অপক্ষপাত কৌতূহল মাত্রই নয়, কার্য্য-কারণের সত্যকার সম্বন্ধ বিচার। চার এবং চারে আট হয়, এবং আট হইতে চার বাদ দিলে চার থাকে ইহাই বিজ্ঞান। এ মনোভাবকে ভয় কিসের? কিন্তু তাই বলিয়া নোঙ্‌রামি যে সাহিত্যের অন্তর্গত নয় একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিজ্ঞান হইলেও নয়, অবিজ্ঞান

হইলেও নয়, সত্য হইলেও নয়, মিথ্যা হইলেও নয়। গল্পের ছলে ধাত্রী-বিদ্যা শিখানোকেও আমি সাহিত্য বলি না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলি না। বোধ হয় বাঙলা দেশের একজনও অতি-আধুনিক সাহিত্য-সেবী একথা বলে না।

বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মপুস্তক রচনা করা যায়, আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করা যায়, রূপকথা-সাহিত্যও রচনা করা না যায় তাহা নহে, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে। রাজার পুত্র গেলেন চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তর মাঠের দুর্গম পথ পার হইয়া রাজকন্যার সন্ধানে। কোটালপুত্রের ডিটেক্‌টিভবুদ্ধি তাঁহার নাই, সওদাগর পুত্রের বেনেবুদ্ধি তাঁহার নাই, আছে শুধু রস। গিয়া বলিলেন, তুমি যে তুমি এই আমার যথেষ্ট। এই রস উপভোগ করিবার মত রসজ্ঞ ব্যক্তির সংসারে অভাব নাই তাহা মানি, কিন্তু ভিন্ন রুচির লোকও ত সংসারে আছে? তাহারা গিয়া যদি বলে, রাজপুত্র, তোমার মনের মধ্যে রাজকন্যার রূপ-যৌবন স্থান পায় নাই, যৌতুকস্বরূপ অর্দ্ধেক রাজত্বের প্রতিও তোমার কিছুমাত্র খেয়াল নাই, তুমি মহৎ। কন্যাটি যে ঘুঁটে-কুড়োনির কন্যা নয় রাজার কন্যা ইহাই তোমার যথেষ্ট। মনস্তত্ত্বের অবতারণায় প্রয়োজন নাই, কিন্তু রাজপুত্র! তোমার মনের কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া না বলিলে ত এই উচ্চাঙ্গের রস-সাহিত্যের সমস্ত রসটুকু উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, ত ইহাদের মুখেই বা হাত চাপা দিবে কে?....

....কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। ইহাদের ধর্ম্মও এক নয়, ধর্ম্মের সীমানাও এক নয়। এবং মানুষের বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধার জাতি-ভেদ এতই গভীর ও বিস্তৃত যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব-নিয়ন্ত্রিত কল্পনাকে বিসর্জ্জন দিলে ইহাদের অর্থ ই প্রায় থাকে না।

....কবি তাঁহার সাহিত্য-ধর্ম্মে নর-নারীর যৌন-মিলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার মনে হয় উপন্যাস-সাহিত্যেও তাহা খাঁটি কথা। তাঁহার বক্তব্য বোধ হয় ইহাই যে ও ব্যাপারটা ত আছেই। কিন্তু মানুষের মাঝে যে ইহার দুটি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্ মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত কর্ত্তা হইবে এইটিই আসল প্রশ্ন। বাস্তবিক, ইহাই হওয়া উচিত আসল প্রশ্ন নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমা-রেখা কি ইহার আছে না কি যে, ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর অপরের হাতে তাহাই কদর্য্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বে-আব্রু এ সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আসল উপদেশটি সকল সাহিত্য-সেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত। নর-নারীর যৌন-মিলন যে সকল রস সাহিত্যের ভিত্তি এ সত্য কবি অস্বীকার করেন নাই। তথাপি মোট কথাটি বোধ হয় তাঁহার এই যে, ভিত্তির মত ও-বস্তুটি সাহিত্যের গভীর ও গোপন অংশেই থাক্। বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়। ততই শিল্পীর ইচ্ছামত তাহাতে কারুকার্য্য রচনা করা চলে। গাছের শিকড়, গাছের জীবন ও ফুল-ফলের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হৌক তাহাকে খুঁড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্য্যও যায় প্রাণও শুকায়। এ সত্য যে অভ্রান্ত তাহা ত না বলা চলে না। অবশ্য, ঠিক এ জিনিষটিই আধুনিক সাহিত্যে ঘটিতেছে কি না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।....

...."বিদেশের আমদানি" কথাটা তাঁহার ক্ষোভেরই কথা। দেশ ভেদে সাহিত্যের ভাষা আলাদা হয়, কিন্তু সত্যকার সাহিত্যের যে দেশ-বিদেশ নাই এ সত্য কবি জানেন। এবং সকলের চেয়ে বেশি

করিয়াই জানেন। তা না হইলে আজ বিশ্বশুদ্ধ লোকে তাঁহাকে বিশ্বের কবি বলিয়া মর্য্যাদা দিত না। কবির সৃষ্টি সমুদ্রের ন্যায় অপরিসীম। নজির আছে জানি, তথাপি সেই সমুদ্র হইতেই স্বমতের অনুকূলে নজির তুলিয়া তাঁহাকে খোঁটা দেওয়া শুধু অবিনয় নয়, অন্যায়।...

....বিদেশের আমদানী কথাটা মুর্গী খাওয়ার অপবাদ নয় যে শুনিবামাত্রই লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হইবে। অতএব, সাহিত্যিকের শুভবুদ্ধি যদি কল্যাণের নিমিত্তই ইহার আমদানী প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন এমন কেহই নাই যে তাঁহার কণ্ঠরোধ করিতে পারে। যত মত-ভেদই থাক্ গায়ের জোরে রুদ্ধ করিবার চেষ্টায় মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই অধিক হয়। কিন্তু এই সকল অত্যন্ত মামুলি কথা কবিকে স্মরণ করাইয়া দিতে আমার নিজেরই লজ্জা করিতেছে। ইহা যে প্রায় অনধিকার চর্চ্চার কোঠায় গিয়া পড়িতেছে তাহাও সম্পূর্ণ বুঝিতেছি, কিন্তু না বলিয়াও কোন উপায় পাইতেছি না।

এ প্রবন্ধের কলেবর আর অযথা বাড়াইব না। কিন্তু উপসংহারে আরও দুই একটা সত্য কথা সোজা করিয়াই কবিকে জানাইব। তাঁহার সাহিত্য-ধর্ম্ম প্রবন্ধের শেষ দিকটার ভাষাও যেমন তীক্ষ্ণ শ্লেষও তেমনি নিষ্ঠুর। তিরস্কার করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে একথা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু সত্যই কি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য রাস্তার ধূলা পাঁক করিয়া তুলিয়া পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করাটাকেই সাহিত্য-সাধনা জ্ঞান করিতেছে? হয়ত, কখনো কোথাও কাহারও ভুল হইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের প্রতি এত বড় দণ্ডই কি সুবিচার হইয়াছে?

কবি বলিয়াছেন, "সে দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনখানেই প্রবেশাধিকার

পায়নি—” এই যদি সত্য হইয়া থাকে ত ভারতের দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের কথা। হয়ত প্রবেশাধিকার পায় নাই, হয়ত এ বস্তু সত্যই ভারতে ছিল না, কিন্তু কোন একটা জিনিষ শুধু কেবল ছিল না বলিয়াই কি চিরদিন বর্জ্জিত হইয়া থাকিবে? ইহাই কি তাঁহার আদেশ? পরের লাইনে কবি বলিয়াছেন, “সে-দেশের (অর্থাৎ বাঙ্‌লা দেশের) সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্ল্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে?”

দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন নাই, চাপা দেওয়াও অন্যায়, কিন্তু ভক্তের মুখের ধার-করা অভিমতটাকেই অসংশয়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাতেই কি ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না?....

....নিজের সাহিত্যিক জীবনের কথা মনে পড়ে। এই তো সেদিনের কথা। গালিগালাজের আর অন্ত ছিল না। অনেক লিখিয়াছি, সকলকে খুসি করিতে পারি নাই, ভুল করিয়াছিও বিস্তর। কিন্তু একটা ভুল করি নাই। স্বভাবতঃ নিরীহ শান্তি-প্রিয় লোক বলিয়াই হৌক, বা অক্ষমতা বশতই হৌক, আক্রমণের উত্তরও দিই নাই, কাহাকে আক্রমণও করি নাই। বহুকাল হইয়া গেলেও কবির নিজের কথাও হয়ত মনে পড়িবে। সংসারে চির-দিনই কিছু কিছু লোক থাকে যাহারা সাহিত্যের এই দিকটাই পছন্দ করে। এখন বুড়া হইয়াছি, মরিবার দিন আসন্ন হইয়া উঠিল, গাল-মন্দ আর বড় খাই না। শুধু পথের দাবী লিখিয়া সেদিন মানসী পত্রিকার মারফতে এক রায়সাহেব সব্‌-ডেপুটির ধমক খাইয়াছি। বইয়ের মধ্যে কোথায় সোনাগাছির ইয়ার্কি ছিল অভিজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষে তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। সে যাই হৌক, আমাদের দিন গত হইতে বসিয়াছে। এখন একদল নবীন সাহিত্য-ব্রতী সাহিত্য-সেবার ভার গ্রহণ করিতেছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করি। এবং যে কয়টা দিন বাঁচিব শুধু এই কাজটুকু নিজের হাতে রাখিব।

কিন্তু কিছুদিন হইতে দেখিতেছি ইহাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড অভিযান সুরু হইয়াছে। ক্ষমা নাই, ধৈর্য্য নাই, বন্ধুভাবে ভ্রম-সংশোধনের বাসনা নাই, আছে শুধু কটূক্তি, আছে শুধু সুতীব্র বাক্যশেলে ইহাদের বিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প। আছে শুধু দেশের ও দশের কাছে ইহাদের হেয় প্রতিপন্ন করিবার নির্দ্দয় বাসনা। মতের অনৈক্যমাত্রই বাণীর মন্দিরে সেবকদিগের এই আত্মঘাতী কলহে না আছে গৌরব না আছে কল্যাণ।

বিশ্বকবির এই সাহিত্যধর্ম্মের শেষের দিকটা আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তিনি বিরূপ, আমার কথা হয়ত তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সত্যই নিবেদন করিতেছি যে, বাঙলা-সাহিত্য-সেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় যাহারা তাঁহার কানের কাছে "গুরুদেব" বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।"

'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'তে শরৎচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথকে অযথা কটূক্তি করেছেন? এ-বিষয়ে রাধারাণী দেবীর একখানা চিঠির উত্তরে শরৎচন্দ্র, ১৯২৭ সালের ১০ অক্টোবর, লিখেছেন, ঃ "আমার লেখা 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' পড়ে তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছ লিখেচ। তোমার মনে হয়েছে যে রবিবাবুকে আমি অযথা কটূক্তি করেছি। কিন্তু কোথায় যে শ্লেষ অথবা বিদ্রূপ আছে আরও একবার পড়েও ত আমি খুঁজে পেলাম না। তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করি—আমার গুরুস্থানীয় তিনি, এ ত তুমি জানোই। তবে হয়ত লেখার দোষে যা বলতে চেয়েছি বলতে পারিনি—আর এক রকমের অর্থ হয়ে গেছে। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে সে আমার অক্ষমতার, আমার অন্তরের নয়।...."

'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'র সূত্রে একজন লেখক, ১৩৩৪

বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি'তে মন্তব্য করেছেন : শরৎ-বাবুর উদ্দেশ্য যে রবীন্দ্রনাথের উপর "ঝাল ঝাড়া" সেটা সুস্পষ্ট। শোনা যায় পাণিত্রাসের ছোট সম্রাট পাঠক সাধারণের উপর "পথের দাবী" নামক road tax জাতীয় শুল্ক জাহির করিয়াছিলেন যাহা বৃটিশ-রাজ নাকচ করিয়া দিয়াছেন। এই লুপ্ত শুল্কের পুনরুদ্ধার ভার তিনি রবীন্দ্রনাথের স্কন্ধে চাপাইতে উদ্যত হইলে রবীন্দ্রনাথ অসামর্থ জ্ঞাপন করেন। ফলে ক্ষুদ্র সম্রাট তাঁহারই মডেলের নায়কের ন্যায় ডান হাতে বাঁ হাতে বন্দুক চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।..."

এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিজাকুমার বসুর আলাপ-পরিচয় সম্পর্কে একটি কাহিনী নিবেদন করা যেতে পারে। নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন :

"সেকালে যখন এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের দোকান ছিল হ্যারিসন রোডের ওপরে, তখন কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক সেখানে প্রত্যহ সমবেত হতেন। মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রও সেখানে গিয়ে এই বৈকালিক মজলিস জমিয়ে তুলতেন। যে-সব সাহিত্যিক সেখানে যেতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগী। আমাদের কবিবন্ধু গিরিজাকুমার বসু ছিলেন এইসব রবীন্দ্রানুরাগীদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অনন্যসুলভ। উত্তরের প্রত্যাশা না করে প্রতি সপ্তাহে একাধিকবার তিনি রবীন্দ্রনাথকে পত্র দিতেন। একদিন এই মজলিসে জানতে পারা গেল, শরৎচন্দ্রই গিরিজাকুমারকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন।

এম. সি. সরকারের বইএর দোকানে একদিন বিকেলবেলায় কয়েকজন সাহিত্যিক বসে আছেন, এমন সময় সেখানে শরৎচন্দ্রের প্রবেশ। ঘরে ঢুকে শরৎচন্দ্র একবার সব-ক'টি সাহিত্যিকের উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। শরৎচন্দ্র আসন গ্রহণ করা মাত্রই একজন

সাহিত্যিক বললেন, "একি করলেন, শরৎদা, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আপনি অমন করে লিখলেন?" (তখন একখানি সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে শরৎচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।)

আর একজন সাহিত্যিক বললেন, "না দাদা, রবীন্দ্রনাথকে ও-রকম করে বলা আপনার উচিত হয়নি।"

শরৎচন্দ্র বললেন, "মনটা আমার আগে থেকেই বিগড়ে ছিল হে। এবারের কারণ তো তুচ্ছ—সাহিত্যিক মতবাদের ব্যাপার। কিন্তু আসল কারণ তো তোমরা জানো না।"

সকলেই আসল কারণটি শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। শরৎচন্দ্র বললেন, "রবীন্দ্রনাথকে আমি তিন বারে তিনটি অনুরোধ করেছিলাম। প্রথম অনুরোধ করেছিলাম—চরকায় সুতো কাটবার জন্যে। আমার সে অনুরোধ তিনি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বারে অনুরোধ করলাম, আমার 'ষোড়শী' নাটকে গান লিখে দেবার জন্যে। তাও তিনি দিলেন না। তৃতীয়বারে তাঁকে অনুরোধ করলাম আমার 'পথের দাবী'র সম্বন্ধে। একখানি 'পথের দাবী' তাঁর কাছে পাঠিয়ে জানালাম যে, 'শুনতে পাচ্ছি বইখানা গভর্নমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করবে। আপনি যদি বইখানির নির্দোষিতা সম্বন্ধে একখানি সার্টিফিকেট দেন, তাহলে গভর্নমেণ্ট বাজেয়াপ্ত নাও করতে পারে।' তাতে কবি কি বললেন জানো? বললেন: 'তোমার বই পড়লাম। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট মাত্র বইখানা বাজেয়াপ্ত করে রেহাই দেবে, অন্য কোনো গভর্নমেণ্ট হলে তোমাকে শূলে চড়াতো।' .... আচ্ছা বলো দেখি, এ কথা শুনে কার না রাগ হয়? তবে আমি কড়ায়-গণ্ডায় তার প্রতিশোধ নিয়েছি। তোমরা মাসিকপত্রের ঐ প্রবন্ধটি দেখেছ শুধু, —আর তো কোনো খোঁজ রাখ না।"

"আবার কি করেছেন, শরৎদা?"

শরৎচন্দ্র অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "এই গিরিজাকে নিয়ে গিয়ে আমিই তো কবির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম।"

(নলিনীকান্ত সরকার : শ্রদ্ধাস্পদেষু, কলকাতা, ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃ. ১১৪-১৬)

অতি আধুনিকদের রচনার প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র, ১৯৩১ সালের মে মাসে, কুমিল্লায় একদিন বলেছেন—প্রথমটায় ওদের আমি সবগুলো বই পড়িনি। ওরা মনে করেছিল আমি বুঝি ওদের ক্যাপ্টেন ; এ নিয়ে আমার রবিবাবুর সঙ্গে অনর্থক একটা মনোমালিন্য হয়ে গেছে। এখন পড়ে দেখছি, ওতে সব নোংরামি, সেক্স নিয়েই ওরা লিখেছে ; বেশ্যাবাড়ীর ডেসক্রিপশন,—ও ত সদাসর্ব্বদাই হচ্ছে— এর ভেতর আর্ট বা সৌন্দর্য্য একটুও নেই। আর আশ্চর্য্য এদের স্পর্দ্ধা, রবিবাবু,—যাঁর প্রত্যেক বর্ণ থেকে অনেক কিছু শেখবার আছে তাঁকে বলে কিনা শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকেছে। আমি ত পড়ে মনে করেছিলুম ওটা প্রিন্টিং মিষ্টেক। মতের মিল না হয় সবিনয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিবাদ করবে। এরা ত প্রতিবাদ করে না, অপমান করে ছেড়ে দেয়। সম্মানিত ব্যক্তিকে অপমান করাটাই সাহস নয়। (সঞ্জয় ভট্টাচার্য : শরৎ প্রসঙ্গ, 'নবশক্তি', ১২মে ১৯৩১, পৃ. ৭)।

তারপর একটানে 'ষোড়শী'র কথায় চলে আসা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৮ সালের ১৭ ফেব্রুআরি, শরৎচন্দ্রকে লিখেছেন :

"তোমার 'ষোড়শী' পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তা হলে চেষ্টা করতুম, কেন না, নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

আমার বিশ্বাস তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুটিই যখন সত্যভাবে মেলে তখনই চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেন না, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত।

তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিঁকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েচ, এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ন করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চলতি সেন্টিমেণ্ট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোন দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড়ো সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুসি থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে?"

এই চিঠিখানার উত্তরে শরৎচন্দ্র, ১৯২৮ সালের ১০ মার্চ, রবীন্দ্রনাথকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশ-

বিশেষ উদ্ধার করি : "এই নাটকখানা লিখেচি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি এতে তা পারি নি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সঙ্কীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারম্বার অনুভব করেচি—এ ঠিক হচ্চে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয় তখন ঠিক কি ভাবে যে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধ করি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে। একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ হয়, কিন্তু আর দিকে ত্রুটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস। আপনি যাকে বলেছেন, এ দেশের লোক-যাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধ হয়, এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি কোরে। সেই জানাই হ'ল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয় নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধহয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হোল না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।"

রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৮ সালের ১১ মার্চ, শরৎচন্দ্রকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি ঃ

“আমি জ্বরে পড়ে আছি, তবু তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসলুম। ভয় হয়েছিল পাছে আমার সমালোচনা পড়ে তুমি অতিশয় বিরক্ত হয়ে থাক। তোমার চিঠিখানা পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি।

গোড়াতেই একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। তোমার প্রতিভা আছে বলেই তোমার কাছে দাবী করি সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী।··· তোমার যে সব গল্প পড়েচি, তাতে তুমি অতি অনায়াসে চিরকালের সত্যকে মূর্তি দিয়েচ—দশের বাণী তোমার বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ সত্যের ছবিতে নিজের দাগা দেগে দিতে পারে নি। তখন তুমি জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে ছিলে। তোমার এখনকার লেখা পড়তে ভয় হয় পাছে চোখে পড়ে যে, তোমার কলমের উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভিড়ের লোকের মনটা ভর করেচে। সে এত বড় লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।

তোমার নাটকে যে perspective-এর কথা বলেছি, সে হচ্ছে নাটকের আখ্যান বস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লীগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা কিছু বলতে চেয়েচ তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত করে বলতে তাহলে ভাষায় ঘটনায় অন্য রকম হত—মূল কথাটা বজায় থাকত কিন্তু রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হলে তবেই সেটা সত্য হয়।

একটা কথা মনে রেখো, আমি তোমার এই নাটক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলুম যদি তোমার নিজের মনে হয় সেটা অসঙ্গত, তাহলে সেটাকে মন থেকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ো। তোমার নিজের সৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজেরই মনে, যদি সেটাকে রক্ষা করে

থাকো তাহলে বলবার কথা কিছু নেই—যদি জনসাধারণের ফরমাস তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে তাহলেই ভাববার কথা।”

শরৎচন্দ্রের ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্মতিথিতে, ১৯২৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, বিরাট সভার অধিবেশন হয়েছে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর, লিখেছেন ঃ “শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মাননা সভায় বাঙ্গলা দেশের সকল পাঠকের অভিনন্দনের সঙ্গে আমার অভিনন্দন বাক্যকে আমি সম্মিলিত করি। আজও সশরীরে পৃথিবীতে আছি, সেটাতে সময় লঙ্ঘনের অপরাধ প্রত্যহই প্রবল হচ্ছে, সে কথা স্মরণ করাবার নানা উপলক্ষ্য সর্ব্বদাই ঘটে, আজ সভায় সশরীরে উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দে যোগদান করতে পারলুম না এও তারি মধ্যে একটা। বস্তুত আমি আজ অতীতের প্রান্তে এসে উত্তীর্ণ—এখানকার প্রদোষান্ধকার থেকে ক্ষীণ কর প্রসারিত করে তাঁকে আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাই, যিনি বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের উদয় শিখরে আপন প্রতিভা জ্যোতি বিকীর্ণ করচেন।” (‘ভারতবর্ষ,’ কার্ত্তিক, ১৩৩৫, পৃ. ৭৯৮)

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র, ১৯৩০ সালের দীপালির দিন, বলেছেন ঃ “অত বড় প্রতিভা পৃথিবীতে আর জন্মাবে কি না সন্দেহ।”

১৯৩১ সালের ৮মে রবীন্দ্রনাথের বয়স সত্তর বছর পূর্ণ হল। সপ্তাহখানেক আগে এই উপলক্ষে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর প্রস্তাব নিয়ে অমল হোম আর নীহাররঞ্জন রায় একদিন সামতাবেড়ে গেলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। উনি কি এই উৎসবে যোগ দেবেন ?

কিন্তু এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন শরৎচন্দ্র। বললেন—আমাকে বাপু কমিটি-টমিটিতে রেখো না, ওসব আমি পারব না। আমি তোমাদের পেছনে থাকব। আর ছাখো, আরেকটি কথা, বক্তৃতা-টক্তৃতা আমার দ্বারা হবে না, ওসবে আমায় ডেকো না।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্বোধন সভা হল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে—১৯৩১ সালের ১৬ মে।

সেই সভায় চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন প্রস্তাব করলেনঃ "এই সভার মতে, কবিবরের সমগ্র দেশবাসীর এবং সকল সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কলিকাতা নগরীতে, এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার যথোচিত সংবর্ধনা ও একটি আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।"

এই প্রস্তাব অনুমোদন করতে উঠলেন শরৎচন্দ্র। চমৎকার একটি ছোট বক্তৃতা করলেনঃ "আমি জানি আমাদের দেশের অনেকেই বিশ্বভারতীকে তাঁর একটা খেয়াল বলে মনে করেন। আমি বলি, হলই বা খেয়াল, কিন্তু কার খেয়াল ও কত বড় সে খেয়াল, তা তো আমাদের ভুললে চলবে না। তাই বলি, অনুষ্ঠান করুন, আনন্দোৎসব করুন; সব করুন, কিন্তু আসুন কিছু টাকা তুলে দেশের লোক আমরা তাঁর হাতে দিই। তিনি এই বুড়ো বয়সে দেশ-বিদেশে বিশ্বভারতীর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন —এ-লজ্জা আমাদের।"

সেই সভাতেই জয়ন্তী-উৎসব-পরিষৎ হল। সভাপতি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, অন্যতম সহকারী সভাপতি শরৎচন্দ্র। অমল হোম লিখেছেনঃ "রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসবের উদ্বোধন-সভার সেই দিনটি থেকে শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র সকল রকমে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কমিটির মিটিং-এ প্রায় নিয়মিত এসেছেন—কখনও সোজা সামতাবেড় থেকে। যুক্তি-পরামর্শ যখন যা তাঁর কাছে চেয়েছি, তিনি অকাতরে দিয়েছেন। কত সময়ে নিরুৎসাহ হয়েছি, উৎসাহ দিয়েছেন।"

জয়ন্তীর কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ উত্তরবাংলায় প্রবল বন্যা হল। রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩১ সালের ২৯ অগস্ট, শরৎচন্দ্রকে লিখেছেনঃ "শরৎ, শুনেছি তোমরা আমার অর্ঘ্যরূপে কিছু টাকা সংগ্রহের সঙ্কল্প করেচ। দেশে এখন দারুণ দুর্দ্দিন, এ সময়ে অন্য

কোনও ব্যাপারের জন্যে অর্থের দাবি করা বিহিত হবে না। যদি আমার হাতে কিছু দিতে চাও, তবে সেটারও লক্ষ্য হবে দুর্গতদের দুঃখহরণ। আমিও স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করচি। এই উদ্দেশ্যে একটা কিছু পালাগানের কথা চলচে—এই উপায়ে কিছু কুড়ানো যাবে আশা করি। তোমরা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অল্প স্বল্প যা কিছু একত্র করতে পারবে আমার হাতে দিলে এই পুণ্যকর্ম্মে আমার সহায়তা করা হবে। নিজের শক্তিতে কিছু করতে পারি, এই বন্যাতে সে উপায় রাখেনি।"

ফলে শরৎচন্দ্রের প্রস্তাবমতো বিশ্বভারতীর জন্য রবীন্দ্রনাথকে অর্ঘ্যদান করা হয়নি। সেজন্য বরাবর শরৎচন্দ্রের মনে ক্ষোভ থেকে গেছে।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে টাউনহলে সাহিত্যসম্মেলন হল ১৯৩১ সালের ২৫ ডিসেম্বর। সভাপতি শরৎচন্দ্র। সেদিন শরৎচন্দ্র অসামান্য অভিভাষণ দিয়েছেন। সেই অভিভাষণ বারংবার শোনবার মতো :

"কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো ; বিধাতার এই আশীর্ব্বাদ কেবল আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানবজাতিকে ধন্য করেচে। সৌভাগ্যের এই স্মৃতিকে আনন্দোৎসবে মধুর ও উজ্জ্বল কোরে আমরা উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে চাই, এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও এই পরিচয়টুকু তাদের দিয়ে যাবো যে, কবির শুধু কাব্যই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখেচি, তাঁর কথা কানে শুনেচি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বস্‌বার ভাগ্য আমাদের ঘটেচে। মনে হয়, সেদিন আমাদের উদ্দেশেও তারা নমস্কার জানাবে।

সেই অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ আজকের এই সাহিত্য-সভা। সাহিত্যের সম্মিলন আরও অনেক বসবে, আয়োজনে, প্রয়োজনে তাদের গৌরবও কম হবে না ; কিন্তু আজকের দিনের অসামান্যতা তা'রা পাবে না। এ'তো সচরাচরের নয়, এ বিশেষ একদিনের, তাই এর শ্রেণী স্বতন্ত্র।

সাহিত্যের আসরে সভা-নায়কের কাজ করবার ডাক ইতিপূর্ব্বে আমার আরও এসেচে, আহ্বান উপেক্ষা করতে পারিনি, নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করেও সসঙ্কোচে কর্ত্তব্য সমাপন করতে এসেচি; কিন্তু এই সভায় শুধু সঙ্কোচ নয়, আজ লজ্জা বোধ করচি। আমি নিঃসংশয় যে, এ গৌরব আমার প্রাপ্য নয়, এ-ভার বহনে আমি অক্ষম। এ আমার প্রচলিত বিনয় বাক্য নয়, এ আমার অকপট সত্য কথা।

তথাপি আমন্ত্রণ অস্বীকার করিনি। কেন যে করিনি, আমি সেইটুকুই শুধু ব্যক্ত কোরব।

আমি জানি, বিতর্কের স্থান এ নয়, সাহিত্যের ভালোমন্দ বিচার, এর জাতিকুল নির্ণয়ের সমস্যা নিয়ে এ পরিষদ আহূত হয়নি - তার প্রয়োজন যথাস্থানে— আমরা সমবেত হয়েচি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে দিতে, তাঁকে সহজভাবে বল্‌তে—কবি, তুমি অনেক দিয়েচো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েচি। সুন্দর, সবল, সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েচো তুমি, দিয়েচো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েচো অপরূপ সাহিত্য, দিয়েচো জগতের কাছে বাঙ্‌লার ভাষা ও ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েচো যা' সকলের বড়—আমাদের মনকে দিয়েচো তুমি বড় ক'রে। তোমার সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমার সাধ্যাতীত—এ আমার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ; প্রাজ্ঞমান যাঁরা, যথাকালে তাঁরা এর আলোচনা করবেন; কিন্তু তোমার কাছে আমি নিজে কি পেয়েছি, সেই কথাটাই ছোট করে জানাবো ব'লেই এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

ভাষার কারুকার্য্য আমার নেই। ওতে যে পরিমাণ বিদ্যা এবং শিক্ষার প্রয়োজন, সে আমি পাইনি; তাই, মনের ভাব প্রচলিত সহজ কথায় বলাই আমার অভ্যাস,—এবং এমনি কোরেই বল্‌তে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্গ্রহ এসে বিঘ্ন ঘটালে। একে আমি বিখ্যাত কুঁড়ে, তাকে বায়ু-পিত্ত-কফ-আদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত চরের দল একযোগে

কুপিত হ'য়ে আমাকে শয্যাশায়ী করে দিলে। এমন ভরসা ছিল না যে, নড়তে পারবো। কিন্তু একটা বিপদ এই যে, চিরকাল দেখে আসচি, আমার অসুখের কথা কেউ বিশ্বাস করে না; যেন ও আমার হ'তে নেই। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সবাই ঘাড় নেড়ে স্মিতহাস্যে বলচেন, উনি অ।'সন নি তো? এ আমরা জান্‌তাম। সেই বাক্যবাণের ভয়েই আমি কোনমতে এসে উপস্থিত হয়েচি। এখন দেখচি ভালই করেচি। এই না-আসতে পারার দুঃখ আমার আমরণ ঘুচত না। কিন্তু যা লিখে আনবার ইচ্ছে ছিল, সে হ'য়ে ওঠেনি। একটা কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করেচি, তার চেয়েও বড় কৈফিয়ৎ আছে। মানুষের অল্পসল্প পাওয়ার কথাই মনে থাকে, তাই লিখতে গিয়ে দেখলাম কবির কাছ থেকে পাওয়ার হিসেব দিতে যাওয়া বৃথা; দফা-ওয়ারি ফর্দ্দ মেলে না।

ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বা'র হই। ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশযাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায় নির্জ্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর-অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে, অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান ক'রে দেন। সেখানে আর এক দফা সম্বর্দ্ধনা লাভের পর আবার বোধোদয়, পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্টসরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাগরেদি সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ-যাত্রা,—আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন্ সম্বর্দ্ধনার ঘটা—এমনি কোরে বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল।

এলাম সহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি ক'রে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে; তার পাঠ্য—সীতার বনবাস,

চারুপাঠ সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু প'ড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তারপরে বহু দুঃখে আর-একদিন সে-মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য আছে।

যে-পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য; সেখানে সবাই চায় পাশ করতে এবং উকীল হ'তে; এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্যায় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ; কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় ক'রে তিনি একদিন প'ড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের "প্রকৃতির প্রতিশোধ"। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চ'লে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটলো, এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এর পরে এ-বাড়ীর উকীল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইলো না, আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরোনো পল্লী-ভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বের কোরলাম "হরিদাসের গুপ্তকথা" আর বেরোলো "ভবানী পাঠক"। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্যপুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হোলো আমাকে বাড়ীর গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে।

একই স্কুলে বেশিদিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টারমশাই স্নেহবশে এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হোল সহরে। বলা ভাল, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয়নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রেব গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না, প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হ'য়ে গেল। বোধ হয়, এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তারপরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'চ্চে। ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলবো না। কোনো কিছু যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায় এর পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, একথা সত্য নয়। ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এতবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে, জীবনে একটা ছত্রও কোনো দিন লিখেচি। দীর্ঘকাল কাট্‌লো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র ক'রে কি ক'রে যে নবীন বাঙ্‌লা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভ'রে উঠলো, আমি তার কোনো খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনো দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তার কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইনি,

আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন ; এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্য ; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বারবার ক'রে পড়েছি,- কি তার ছন্দ, ক'টা তার অক্ষর, কা'কে বলে Art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটেছে কি না,—এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকুই ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হ'তেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হ'য়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হোলো না। আর কোথাও না-হোক্, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে আমি পারিনে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ওর অন্তরের সন্ধান আমাকে দিয়েছে। পণ্ডিতের তত্ত্ববিচারে তা'তে ভুল যদি থাকে তো থাক্, কিন্তু আমার কাছে সেই সত্য হ'য়ে আছে।

জানি, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় এ সকল অবান্তর, হয়ত বা অর্থহীন ; কিন্তু গোড়াতেই আমি বলেচি যে, আলোচনার জন্য আমি আসিনি, এর সহস্র ধারায় প্রবাহিত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের বিবরণ দেওয়াও আমার সাধ্যাতীত, আমি এসেছিলাম শুধু আমার ব্যক্তিগত গোটাকয়েক কথা এই জয়ন্তী-উৎসব সভায় নিবেদন করে যেতে।

কাব্য, সাহিত্য ও কবি রবীন্দ্রনাথকে আমি যে-ভাবে লাভ করেছি, তা জানালাম। মানুষ-রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি

সামান্যই এসেছি। কবির কাছে একদিন গিয়েছিলাম বাঙ্গলা সাহিত্য সমালোচনার ধারা প্রবর্ত্তিত করার প্রস্তাব নিয়ে। নানা কারণে কবি স্বীকার করতে পারেননি, আর তার একটা হেতু এই দিয়েছিলেন যে, যার প্রশংসা করতে তিনি অপারগ, তার নিন্দে করতেও তিনি তেমনি অক্ষম। আরো বলেছিলেন যে, তোমরা যদি একাজ কর, কখনো ভুলো না যে অক্ষমতা ও অপরাধ এক বস্তু নয়। ভাবি, সাহিত্য-বিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখ্‌ত!

কিন্তু, এই সভার অনেকখানি সময় নষ্ট করেছি, আর না। অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচন করারই এটা দণ্ড। এ আপনাদের সইতেই হবে। সে যাই হোক্, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এ সমাদর ও সম্মান আমার আশার অতীত। তাই সকৃতজ্ঞচিত্তে আপনাদিগকে নমস্কার জানাই।"

১৯৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর কবিসংবর্ধনা হল টাউনহলে। শরৎচন্দ্র মানপত্র লিখেছেন:

"কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষ শেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হৌক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত সেবক না ইহার নির্ম্মাণকল্পে দ্রব্য-সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই

বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত মনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি। ইতি

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮ই অগ্রহায়ণ ৩৮"

সভাপতি হিসাবে এই মানপত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্বাক্ষর করেছেন।

অমল হোম লিখেছেন: "রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব সভায় সেই মানপত্র শরৎচন্দ্র স্বয়ং পাঠ করেন, এই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কি করে জানি না তাঁর কানে গিয়েছিল, কমিটির সভ্যদের মধ্যে এতে দ্বিমত আছে: তাই তাঁকে রাজি করাতে পারিনি। অসুস্থতাবশতঃ সভাপতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সেই মানপত্র পাঠ করেছিলেন কবি কামিনী রায়। আমার মনে আছে, মানপত্র যখন পড়া হচ্ছিল, শরৎবাবু তখন যেন সংকোচে সারা হয়ে মাথা নিচু করে বসেছিলেন, কেননা সেটি যে তাঁরই রচনা, সে-কথা কাগজে আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল।"

সমস্ত অন্তর দিয়ে শরৎচন্দ্র এই জয়ন্তীতে যোগ দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র, ১৯৩২ সালের ১৩ জানুআরি, লিখেছেন: "কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও তেম্‌নি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি গুরু ব'লে—আমার চাইতে কেউ বেশী মক্‌সো করে নি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশী

বার কেউ পড়ে নি তাঁর উপন্যাস,—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা প'ড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি। আর কেউ বললে কি না-বললে, মানলে কি না-মানলে তাতে কিছু এসে যায় না। তাই আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই জয়ন্তীতে, না দিয়ে পারি নি।"

উত্তরকালে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের মধ্যে এক সময়ে বেশ দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত, তখন বাঙলা সাহিত্যের এই দুই দিক্‌পালের সদালাপের সময়ে হাজির থাকার সৌভাগ্য বার কয়েক হ'য়েছিল। কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের এক ঔপন্যাসিক-যশঃ-প্রার্থীর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র একবার ব'লেছিলেন—"অমুক উপন্যাস লিখ্‌তে লেগে গিয়েছে— আপনি তাকে এখন-ই ঠেকান, নইলে পরে সামলানো কঠিন হবে।" ১৯৩১ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর বয়স হওয়ায় 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেই সম্পর্কে The Golden Book of Tagore—A Homage to Rabindranath Tagore from India and the World নামে ইংরিজিতে অভিনন্দন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, বন্ধুবর কালিদাস নাগ আর আমার উপর ভার পড়ে, সেই বইখানি ছাপিয়ে বা'র কর্‌বার জন্য। এই কাজে 'জয়ন্তী'-র কয় দিন আমাদের বহু রাত জেগে, সেণ্ট্রাল আভেনিউতে আর্ট প্রেসে গিয়ে খাট্‌তে হ'য়েছিল আর 'জয়ন্তী'-র অন্য অন্য বিভাগের উদ্যোক্তাদের সঙ্গেও পরামর্শাদি ক'র্‌তে হ'য়েছিল। শরৎচন্দ্র তখন 'জয়ন্তী' উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রশস্তি রচনা করেন, বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথের এই প্রশস্তি পুঁথির আকারে রূপায়িত নন্দলালের হাতের লেখা লিপিতে সোনার পাতে কালো মীনা ক'রে বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে প্রণামীরূপে দেওয়া হয়। এই প্রশস্তি-রচনার সময়ে আমরা

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে' কয়েকবার দেখা করি, নানা বিষয়ে তখন অনেক কথাও আমাদের হয়। বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে শরৎচন্দ্র 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'তে অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা আর প্রীতির পরিচয় তখন আমরা পাই, আর তা পেয়ে মুগ্ধ হই।"

১৯৩২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা টাউনহলে শরৎচন্দ্রের জন্মজয়ন্তীর আয়োজন হয়েছে। কথা ছিল, সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আসতে পারেন নি। তিনি আশীর্বাণী পাঠিয়েছেন ঃ

"কল্যাণীয়েষু—শরৎচন্দ্র, বিশেষ উদ্বেগজনক সাংসারিক ঘটনায় তোমার জন্মদিনের উৎসবে সম্মাননা সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হোলো। অগত্যা আমার আন্তরিক শুভ কামনা এই উপলক্ষ্যে পত্র যোগে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।....

তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে "কালের যাত্রা" নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয় নি।....

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ. ১৯৩২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, আলাদা একখানা চিঠি লিখেছেন শরৎচন্দ্রকে। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি ঃ "তোমার প্রতিভার দ্বারা দেশের হৃদয়কে তুমি জয় করেচ, দেশের গভীর অন্তরে তোমার প্রবেশাধিকার। তোমার লেখনী বাঙালীর চিত্ততন্তকে হাসি ও অশ্রুর নবতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করে তুলেছে। যেখানে তার মনোমন্দিরে চিরন্তনের পুণ্য বেদিকা, সেইখানে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যপ্রদীপ বাংলা সাহিত্যের জ্যোতিঃশিখায় দীর্ঘ আয়ুঃসঞ্চার করবার জন্য

প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এই কথা জেনে আমার কর্মাবসানের পশ্চিমদ্বার থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি।"

শরৎচন্দ্র, ১৯৩২ সালের ১৫ অক্টোবর, রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন: "কালের যাত্রার সঙ্গে যে আশীর্ব্বাদ আপনার পাইলাম সে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনার তুচ্ছতম দানও জগতের যে কোন সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ দান মাথায় করিয়া লইলাম।"

এখানে বলা দরকার, ১৯৩২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা টাউনহলে শরৎচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী কতিপয় বিভ্রান্ত যুবক ভণ্ডুল করেছে। 'বঙ্গবাণী', ১৯৩২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর, লিখেছে: "বাঙ্গলার কথাশিল্পী ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সপ্ত পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে গতকল্য টাউনহলে তাঁহাকে যে অভিনন্দন দেওয়ার আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহা শেষ মুহূর্ত্তে আর হইতে পারে নাই, কারণ কতিপয় বিভ্রান্ত যুবক শরৎচন্দ্রকে টাউনহলে যাইয়া অভিনন্দন গ্রহণ না করিবার জন্য অনুরোধ করায় এবং কেহ কেহ তাঁহার মোটরের সম্মুখে শুইয়া পড়িয়া তাঁহার গাড়ীর গতিরোধ করায় তিনি ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।...."

রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩২ সালের ১৭ অক্টোবর, শরৎচন্দ্রকে লিখেছেন: "তোমার প্রতি যে অত্যাচার হয়েছিল তার বিবরণ শুনে লজ্জাবোধ করেছি। কিন্তু একথাও নিঃসন্দেহ যে দেশের লোকের হৃদয় তুমি অধিকার করেচ—এই ভালবাসার চেয়ে মূল্যবান অর্ঘ্য আর কিছু নেই। এই ভালবাসা পেয়েছ বলেই তোমাকে আঘাত সইতে হবে। কেবলমাত্র যদি যশ পেতে, তা নিয়ে কারো মনে যদি কোনো বিরোধ না থাকত, তাহলে সে যশের গৌরব থাকত না। তোমার প্রতিষ্ঠা যতই ব্যাপ্ত হতে থাকবে, ততই তার সঙ্গে তোমার দুঃখও বাড়বে। এজন্য মনকে শক্ত করে নিয়ো। পূজার ছুটির পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা উপলক্ষে কলকাতায় একবার যেতে হবে,

সেই সময়ে তোমার সঙ্গে যাতে দেখা হয়, সেই চেষ্টা করব। দেহ আমার ক্লান্ত কিন্তু ছুটি পাইনে।”

রবীন্দ্রনাথ একখানা চিঠি লিখেছেন দিলীপকুমার রায়কে। চিঠিখানা ‘সাহিত্যের মাত্রা’ নামে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—১৩৪০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে (পৃঃ ৭৫-৮২)। ‘সাহিত্যের মাত্রা’ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি ঃ

“বর্ত্তমান যুগে পূর্ব্ব-যুগের থেকে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়েচে তা নিয়ে তর্ক হতে পারে না। এখনকার মানুষ জীবনের যে-সব সমস্যা পূরণ করতে চায় তার চিন্তা-প্রণালী প্রধানত বৈজ্ঞানিক, তার প্রবৃত্তি বিশ্লেষণের দিকে, এই জন্যে তার মননবস্তু জমে উঠ্‌চে বিচিত্ররূপে এবং প্রভূত পরিমাণে। কাব্যের পরিধির মধ্যে তার সম্পূর্ণ স্থান হওয়া সম্ভবপর নয়। সাবেক কালে তাঁতি যখন কাপড় তৈরি করত তখন চরকায় সুতো কাটা থেকে আরম্ভ করে কাপড় বোনা পর্য্যন্ত সমস্তই সরল গ্রাম্য-জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলত। বিজ্ঞানের প্রসাদে আধুনিক বাণিজ্য-পদ্ধতিতে চলচে প্রভূত পণ্য উৎপাদন। তার জন্যে প্রকাণ্ড ফ্যাক্‌টরির দরকার। চারদিকেব মানব-সংসারের সঙ্গে তার সহজ মিল নেই। এই জন্যে এক-একটা কারখানার সহর পরিস্ফীত হয়ে উঠ্‌চে, ধোঁয়াতে কালিতে যন্ত্রের গর্জ্জনে ও আবর্জ্জনায় তারা জড়িত বেষ্টিত, সেই সঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ বিস্ফোটকের মতো দেখা দিয়েচে মজুর-বস্‌তি। একদিকে বিরাট যন্ত্রশক্তি উদ্ধার করচে অপরিমিত বস্তুপিণ্ড, অন্য দিকে মলিনতা ও কঠোরতা শব্দে গন্ধে দৃশ্যে স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠ্‌চে। এর প্রবলত্ব ও বৃহত্ত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কারখানা-ঘরের সেই প্রবলত্ব ও বৃহত্ত্ব সাহিত্যে দেখা দিয়েচে উপন্যাসে, তার ভূরি আনুষঙ্গিকতা নিয়ে। ভালো লাগুক মন্দ লাগুক আধুনিক সভ্যতা আপন কারখানা-হাটের জন্যে সুপরিমিত স্থান নির্দ্দেশ করতে পারচে না। এই অপ্রাণপদার্থ বহু

শাখায় প্রকাণ্ড হয়ে উঠে প্রাণের আশ্রয়কে দিচ্চে কোণ-ঠাসা করে। উপন্যাস-সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েচে। বলতে পার বর্ত্তমানে এটা অপরিহার্য্য, তাই বলে বলতে পারো না এটা সাহিত্য। হাটের জায়গা প্রশস্ত করবার জন্যে মানুষকে ঘর ছাড়তে হয়েচে, তাই বলে বলতে পারো না সেটাই লোকালয়।

এখনকার মানুষের প্রবৃত্তি বুদ্ধিগত সমস্যার অভিমুখে, সে কথা অস্বীকার করব না। তার চিন্তায় বাক্যে ব্যবহারে এই বুদ্ধির আলোড়ন চলচে।....অতএব আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই। তা হোক, তবু সাহিত্যের মূলনীতি চিরন্তন। অর্থাৎ রস-সম্ভোগের যে-নিয়ম আছে তা মানুষের নিত্য-স্বভাবের অন্তর্গত। যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে যদি প্রকৃতিস্থ থাকে। এই গল্পের বাহন কী, না, সজীব মানবচরিত্র। আমরা তাকে একান্ত সত্যরূপে চিনতে চাই, অর্থাৎ আমার মধ্যে যে ব্যক্তিটা আছে সে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিরই পরিচয় নিতে উৎসুক। কিন্তু কালের গতিকে আমার সেই ব্যক্তি হয়তো অতিমাত্র আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পলিটিক্‌সে। তাই হয়তো সাহিত্যেও ব্যক্তিকে সে গৌণ করে দিয়ে আপন মনের মতো পলিটিক্‌সের বচন শুনতে পেলে পুলকিত হয়ে ওঠে। এমনতরো মনের অবস্থায় সাহিত্যের যথোচিত যাচাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারিনে। অবশ্য গল্পে পলিটিকস্‌প্রবণ কোনো ব্যক্তির চরিত্র যদি আঁকতে হয় তবে তার মুখে পলিটিক্‌সের বুলি দিতেই হবে, কিন্তু লেখকের আগ্রহটা যেন বুলি-জোগান দেওয়ার দিকে না ঝুঁকে প'ড়ে চরিত্র-রচনের দিকেই নিবিষ্ট থাকে। চরিত্রসৃষ্টিকে গৌণ রেখে বুলির ব্যবস্থাকেই মুখ্য করা এখনকার সাহিত্যে যে এত বেশী চড়াও হয়ে উঠ্‌চে তার কারণ আধুনিক কালে জীবনসমস্যার জটিল গ্রন্থি আলগা করার কাজে এই যুগের মানুষ অত্যন্ত বেশী ব্যস্ত।

এই জন্যে তাকে খুসি করতে দরকার হয় না যথার্থ সাহিত্যিক হবার। ...চরিত্ররূপই রসসাহিত্যের, অরূপ তত্ত্ব রসসাহিত্যের নয়।

মহাভারত থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিই। মহাভারতে নানা কালে নানা লোকের হাত পড়েচে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক থেকে তার উপরে অবান্তর আঘাতের অন্ত ছিল না, অসাধারণ মজবুত গড়ন বলেই টিঁকে আছে। এটা স্পষ্টই দেখা যায় ভীষ্মের চরিত্র ধর্ম্মনীতিপ্রবণ—যথাস্থানে আভাসে ইঙ্গিতে, যথাপরিমাণ আলোচনায়, বিরুদ্ধ চরিত্র ও অবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্বে এই পরিচয়টি প্রকাশ করলে ভীষ্মের ব্যক্তিরূপ তাতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠবার কথা। কাব্য পড়বার সময় আমরা তাই চাই। কিন্তু দেখা যাচ্চে কোনো এক কালে আমাদের দেশে চরিত্রনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ বিশেষ কারণে অতিপ্রবল ছিল। এইজন্যে পাঠকের বিনা আপত্তিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাসকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম দীর্ঘ এক পর্ব্ব জুড়ে নীতি কথায় প্লাবিত করে দিলেন। তাতে ভীষ্মের চরিত্র গেল তলিয়ে প্রভূত সদুপদেশের তলায়। এখনকার উপন্যাসের সঙ্গে এর তুলনা করো। মুস্কিল এই যে এই সকল নীতিকথা তখনকার কালের চিত্তকে যে রকম সচকিত করেছিল এখন আর তা করে না; এখনকার বুলি অন্য, সেও কালে পুরাতন হয়ে যাবে। পুরাতন না হলেও সাহিত্যে যে-কোনো তত্ত্ব প্রবেশ করবে, সাময়িক প্রয়োজনের প্রাবল্য সত্ত্বেও সাহিত্যের পরিমাণ লঙ্ঘন করলে, তাকে মাপ করা চলবে না। ভগবদগীতা আজও পুরাতন হয়নি, হয়তো কোনো কালেই পুরাতন হবে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে থমকিয়ে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহই অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে গীতার ভাবের দ্বারা ভাবিত করার সাহিত্যিক-প্রণালী আছে, কিন্তু সৎ কথার প্রলোভনে তার ব্যতিক্রম হয়েচে বললে গীতাকে খর্ব্ব করা হয় না।

যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত রামায়ণে রামের যে-দেখা পাওয়া গেছে সেটাতে রামের চরিত্রই প্রকাশিত। তার মধ্যে ভালো দিক আছে, মন্দ দিক আছে, আত্মখণ্ডন আছে। দুর্ব্বলতা যথেষ্ট আছে। রাম যদিও প্রধান নায়ক তবু শ্রেষ্ঠতার কোনো কাল-প্রচলিত বাঁধা নিয়মে তাঁকে অস্বাভাবিক রূপে সুসঙ্গত করে সাজানো হয়নি। অর্থাৎ কোনো একটা শাস্ত্রীয় মতের নিখুঁৎ প্রমাণ দেবার কাজে তিনি পাঠক-আদালতে সাক্ষীরূপে কাঠগড়ায় দাঁড়াননি। পিতৃসত্য রক্ষা করার উৎসাহে পিতার প্রাণনাশ যদিবা শাস্ত্রিক বুদ্ধি থেকে ঘটে থাকে, বালিকে বধ না শাস্ত্রনৈতিক না ধর্ম্মনৈতিক। তারপরে বিশেষ উপলক্ষ্যে রামচন্দ্র সীতা-সম্বন্ধে লক্ষ্মণের উপরে যে বক্রোক্তি প্রয়োগ করেছিলেন সেটাতেও শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বজায় থাকেনি। বাঙালী সমালোচক যে রকম আদর্শের ষোলো আনা উৎকর্ষ যাচাই ক'রে সাহিত্যে চরিত্রের সত্যতা বিচার ক'রে থাকে সে আদর্শ এখানে খাটে না। রামায়ণের কবি কোনো একটা মতসঙ্গতির লজিক দিয়ে রামের চরিত্র বানাননি, অর্থাৎ সে চরিত্র স্বভাবের, সে চরিত্র সাহিত্যের, সে চরিত্র ওকালতির নয়।

কিন্তু উত্তরকাণ্ড এলো বিশেষ কালের বুলি নিয়ে; কাঁচাপোকা যেমন তেলাপোকাকে মারে তেমনি করে চরিত্রকে দিলে মেরে। সামাজিক প্রয়োজনের গুরুতর তাগিদ এসে পড়ল, অর্থাৎ তখনকার দিনের প্রব্লেম। সে যুগে ব্যবহারের যে আটঘাট বাঁধবার দিন এলো, তাতে রাবণের ঘরে দীর্ঘকাল বাস করা সত্ত্বেও সীতাকে বিনা প্রতিবাদে ঘরে তুলে নেওয়া আর চলে না সেটা যে অন্যায় এবং লোকমতকে অগ্রগণ্য করে সীতাকে বনে পাঠানোর এবং অবশেষে তার অগ্নিপরীক্ষার যে প্রয়োজন আছে সামাজিক সমস্যার এই সমাধান চরিত্রের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসল। তখনকার সাধারণ শ্রোতা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব একটা উঁচুদরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাহবা দিয়েচে। সেই বাহবার জোরে ঐ জোড়া-

তাড়া খণ্ডটা এখনও মূল রামায়ণের সজীব দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে।

....চরিত্রের প্রাণগত রূপ সাহিত্যে আমরা দাবী করবই, অর্থ-নীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি চরিত্রের অনুগত হয়ে বিনীতভাবে যদি না আসে তবে তার বুদ্ধিগত মূল্য যতই থাক তাকে নিন্দিত করে দূর করতে হবে। নভেলে কোনো একজন মানুষকে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল প্রমাণ করতে হবে অথবা ইন্‌টেলেক্‌চুয়েলের মনোরঞ্জন করতে হবে বলেই বইখানাকে এম, এ, পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর পত্র করে তোলা চাই এমন কোনো কথা নেই। গল্পের বইয়ে যাঁদের থীসিস পড়ার রোগ আছে আমি বলব সাহিত্যের পদ্মবনে তাঁরা মত্ত হস্তী।...

প্রাণের একটা স্বাভাবিক ছন্দোমাত্রা আছে; এই মাত্রার মধ্যেই তার স্বাস্থ্য সার্থকতা তার শ্রী। এই মাত্রাকে মানুষ জবর-দস্তি করে ছাড়িয়ে যেতেও পারে। তাকে বলে পালোয়ানি, এই পালোয়ানি বিস্ময়কর, কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয় সুন্দর তো নয়ই। এই পালোয়ানি সীমা-লঙ্ঘন করবার দিকে তাল ঠুকে চলে, দুঃসাধ্য সাধনও করে থাকে কিন্তু এক জায়গায় এসে ভেঙ্গে পড়ে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই ভাঙনের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেচে। সভ্যতা স্বভাবকে এতদূরে ছাড়িয়ে গেছে যে কেবলি পদে পদে তাকে সমস্যা ভেঙে ভেঙে চলতে হয়, অর্থাৎ কেবলি সে করচে পালোয়ানি। প্রকাণ্ড হয়ে উঠ্‌চে তার সমস্ত বোঝা এবং স্তূপাকার হয়ে পড়চে তার আবর্জ্জনা। অর্থাৎ মানবের প্রাণের লয়টাকে দানবের লয়ে সাধনা করা চলচে।....

পশ্চিম মহাদেশের এই কায়াবহুল অসঙ্গত জীবনযাত্রার ধাক্কা লেগেচে সাহিত্যে। কবিতা হয়েচে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেচে বিপরীত মোটা হয়ে। সেখানে তারা সৃষ্টির কাজকে অবজ্ঞা করে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল কসরতের কাজে লেগেচে। তাতে শ্রী নেই, তাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিণ্ড।

অর্থাৎ এটা দানবিক ওজনের সাহিত্য, মানবিক ওজনের নয়; বিস্ময়করৰূপে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল; প্রয়োজনসাধকও হতে পারে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবান নয়।........

তোমার চিঠিতে তুমি আমার লেখা গোরা ঘরে বাইরে প্রভৃতি নভেলের উল্লেখ করেচ। নিজের লেখার সমালোচনা করবার অধিকার নেই, তাই বিস্তারিত করে কিছু বলতে পারব না। আমার এই দুটি নভেলে মনস্তত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে সে কথা কবুল করতেই হবে। সাহিত্যের তরফ থেকে বিচার করতে হলে দেখা চাই যে সেগুলি জায়গা পেয়েচে, না জায়গা জুড়েচে। আহার্য্য জিনিষ অন্তরে নিয়ে হজম করলে দেহের সঙ্গে তার প্রাণগত ঐক্য ঘটে। কিন্তু ঝুড়িতে করে যদি মাথায় বহন করা যায় তবে তাতে বাহ্য প্রয়োজন-সাধন হতে পারে কিন্তু প্রাণের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন হয় না। গোরা গল্পে তর্কের বিষয় যদি ঝুড়িতে করে রাখা হয়ে থাকে তবে সেই বিষয়গুলির দাম যতই হোক না সে নিন্দনীয়। আলোচনার সামগ্রীগুলি গোরা ও বিনয়ের একান্ত চরিত্রগত প্রাণগত উপাদান যদি না হয়ে থাকে তবে প্রব্লেমে ও প্রাণে প্রবন্ধে ও গল্পে জোড়াতাড়া জিনিষ সাহিত্যে বেশী দিন টিঁকবে না। প্রথমত আলোচ্য তত্ত্ববস্তুর মূল্য দেখতে দেখতে কমে আসে, তারপরে সে যদি গল্পটাকে জীর্ণ করে ফেলে তাহলে সবসুদ্ধ জড়িয়ে সে আবর্জ্জনারূপে সাহিত্যের আঁস্তাকুড়ে জমে ওঠে। ইব্‌সেনের নাটকগুলি ত একদিন কম আদর পায়নি কিন্তু এখনি কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসে নি, কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে? মানুষের প্রাণের কথা চিরকালের আনন্দের জিনিষ, বুদ্ধিবিচারের কথা বিশেষ দেশকালে যত নতুন হয়েই দেখা দিক দেখতে দেখতে তার দিন ফুরোয়। তখনো সাহিত্য যদি তাকে ধরে রাখে তাহলে মৃতের বাহন হয়ে তার দুর্গতি ঘটে। প্রাণ কিছু পরিমাণ অপ্রাণকে বহন করেই থাকে যেমন আমাদের বসন

আমাদের ভূষণ, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে রফা করে চলবার জন্যে তার ওজন প্রাণকে যেন ছাড়িয়ে না যায়।....”

‘সাহিত্যের মাত্রা’ পড়ে কারও কারও সন্দেহ হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন শরৎচন্দ্রও তাঁদের মধ্যে একজন। শরৎচন্দ্রেরও সেকথা অসম্ভব মনে হয় নি।

এ-বিষয়ে অতুলানন্দ রায় একখানা চিঠি লিখেছেন শরৎ-চন্দ্রকে উত্তরে শরৎচন্দ্র একখানা চিঠি লিখেছেন অতুলানন্দকে। শরৎচন্দ্রের চিঠিখানা থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধার করি :

“....‘সাহিত্যের মাত্রা’ই বা কি, আর অন্য প্রবন্ধই বা কি, এ কথা অস্বীকার করি নে যে কবির এই ধরণের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। তাঁর উপমা উদাহরণে আসে কল-কব্জা, আসে হাট-বাজার হাতী-ঘোড়া জন্তু-জানোয়ার—ভেবেই পাইনে মানুষের সামাজিক সমস্যায় নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে? শুনতে বেশ লাগ-সই হলেই ত তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছু দিন পূর্ব্বে হরিজনদের প্রতি অবিচারে ব্যথিত হয়ে তিনি প্রবর্ত্তক-সংঘের মতিবাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে অনুযোগ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণীর পোষা বিড়ালটা এঁটো মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না—তিনি আপত্তি করেন না। খুব সম্ভব করেন না, কিন্তু তাতে হরিজনদের সুবিধা হলো কি? প্রমাণ করলে কি? বিড়ালের যুক্তিতে এ কথা ত ব্রাহ্মণীকে বলা চলে না যে, যে-হেতু অতি-নিকৃষ্ট-জীব বেড়ালটা গিয়ে তোমার কোলে বসেছে, তুমি আপত্তি করো নি, অতএব, অতি-উৎকৃষ্ট-জীব আমিও গিয়ে তোমার কোলে বসবো, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। বেড়াল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে, এ সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয় না। এ সব উপমা শুনতে

ভালো, দেখতেও চক্‌চক্ করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে, তা অকিঞ্চিৎকর। বিরাট ফ্যাক্টরির প্রভূত বস্তু-পিণ্ড উৎপাদনের অপকারিতা দেখিয়ে মোটা নভেলও অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ কথা প্রতিপন্ন হয় না।

আধুনিক কালের কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ, ওইটেই হয়েছে ফ্যাশান। এই বহু-নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে, তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবন-যাত্রার প্রণালীও গেছে বদ্‌লে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপশোষ করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না যে হবে না! তাঁর আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে না কটূ কথা দিয়ে? কবি বলেছেন—স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই 'মূল নীতি' লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।

কবি বলচেন, "উপন্যাস সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে, "উপন্যাস সাহিত্যে সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়ে নি, চিন্তার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে" তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজীর দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথও যোগান দিয়েছেন এই বলে যে, "যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।"

বচনটি স্বীকার করে নিয়েও পাঠকেরা যদি বলে—হাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থই আছি, কিন্তু দিন-কাল বদলেছে এবং বয়েসও বেড়েচে ; সুতরাং রাজপুত্র ও ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর গল্পে আর আমাদের মন ভরবে না, তা হলে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ আমি মনে করিনে। তারা অনায়াসে বলতে পারে, গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা' পরিত্যাজ্য হয় না কিম্বা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জ্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।

কবি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখ করে ভীষ্ম ও রামের চরিত্র আলোচনা করে দেখিয়েছেন, 'বুলির' খাতিরে ও দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি আলোচনা করবো না, কারণ, ও-দুটো গ্রন্থ শুধু কাব্যগ্রন্থই নয়, ধর্ম্মপুস্তক ত বটেই, হয়ত বা ইতিহাসও বটে। ও দুটি চরিত্র কেবলমাত্র সাধারণ উপন্যাসের বানানো চরিত্র নাও হতে পারে, সুতরাং সাধারণ কাব্য-উপন্যাসের গজকাঠি নিয়ে মাপতে যেতে আমার বাধে।

চিঠিটায় ইন্‌টালেক্‌ট শব্দটার বহু প্রয়োগ আছে। মনে হয় যেন কবি বিদ্যে ও বুদ্ধি উভয় অর্থেই শব্দটার ব্যবহার করেছেন। প্রব্লেম শব্দটাও তেমনি। উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক, আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রব্লেম, সেটা প্লটের! এর গ্রন্থিই সবচেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমার-সম্ভবের প্রব্লেম, উত্তর কাণ্ডে রামভদ্রের প্রব্লেম, ডল্‌স হাউসের নোরার প্রব্লেম অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম একজাতীয় নয়। যোগাযোগ বইখানা যখন 'বিচিত্রা'য় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবলপরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ্-অফ-ওয়ারের শেষ হবে কি ক'রে ? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্ত্তে এসে। আমাদের জলধর দাদাও প্রব্লেম দেখতে পারেন না, অত্যন্ত চটা। তাঁর একটা বইয়ে

এমনি একটা লোক ভারি সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তার মীমাংসা হয়ে গেল অন্য উপায়ে। ফোঁস করে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে তাকে কামড়ে দিলে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এটা কি হল ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কেন, সাপে কি কাউকে কামড়ায় না ?

পরিশেষে আর একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইবসেনের নাটকগুলি ত একদিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনি কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসে নি, কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে ?" না পড়তে পারে, কিন্তু তবুও এটা অনুমান, প্রমাণ নয়। পরে একদিন এমনও হতে পারে, ইবসেনের পুরনো আদর আবার ফিরে আসবে। বর্ত্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়।"

এই চিঠিখানা সেসময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৩ সালের ২ অক্টোবর, শরৎচন্দ্রকে লিখেছেন : "কোন পত্রিকায় দেখলুম, তোমার বিশ্বাস যে উপন্যাস রচনা নিয়ে একটি পত্রে আমি যে মত প্রকাশ করেছি, তাতে তোমার রচনার প্রতিও আমার লক্ষ্য আছে। বোধ করি তোমাকে উত্তেজিত করবার জন্যই কেউ তোমার কাছে এই সঙ্কেত করে থাকবে। তোমার বা দিলীপের সঙ্গে মতের অনৈক্য হওয়াটা আমার নির্বুদ্ধিতা হতে পারে, কিন্তু সেটা আমার অপরাধ নয়, কিন্তু ইঙ্গিতে তোমাকে আক্রমণ করা যদি আমার কোন লেখার উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটাকে অপরাধ বলেই স্বীকার করব। আমি এমন কাজ করিনি, সেকথা বিশ্বাস করে নিয়ো। তুমি আমাকে বারবার তীব্র ভাষাতেই আক্রমণ করেচ আমি কোনদিন তার প্রতিবাদ করিনি এবং কখনই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তোমাকে নিন্দা করে শোধ তুলি নি। এবারও সেই ফর্দে আর একটি সংখ্যা বাড়ল।...."

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৪ সালের ২ ফেব্রুআরি, দিলীপকুমার রায়কে লিখেছেন :

"সেই যে চিঠিটা আমার স্বদেশ ও প্রচারকে বেরিয়েছিল তার সম্বন্ধে কবি আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তার শেষের দিকে ছিল 'তুমি বার বার আমাকে তীক্ষ্ণ কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছো কিন্তু আমি কখনো প্রকাশ্যে বা গোপনে তোমার নিন্দে ক'রে প্রতিশোধ নিই নি। এ লেখা সেই ফর্দে আর এক সংখ্যা যোগ করলে মাত্র।'

সেদিন উমাপ্রসাদ আমাকে বলছিলেন এ চিঠি লিখে আমি অন্যায় করেচি, কারণ, এর প্রতি ছত্রে বিষ ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু কি করবো নাচার। যা লিখে ফেলেচি সে তো আর ফেরাতে পারবো না। এখন কবির সঙ্গে বিচ্ছেদ বোধ করি আমার পরিপূর্ণ হলো।...."

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৫ সালের ১৭ জানুআরি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন : "সাহিত্যসেবার কাজে তিনি আমার গুরুকল্প। তাঁর ঋণ আমি কোন কালে শোধ করতে পারবো না, মনে মনে তাঁকে এমনি ভক্তি-শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু ভাগ্য বাধ সাধলো,—আমার প্রতি তাঁর বিমুখতার অবধি নেই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৫ সালের মার্চে, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন : "He has imparted a new power to our language and in his stories has shed the light of a fresh vision upon the too familiar region of Bengal's heart revealing the living significance of the obscure trifles in people's personality. He has achieved the best reward of a novelist : he has completely won the hearts of Bengali readers."

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৬ সালের ১৭ জানুআরি, লিখেছেন : "আমার

চেয়ে কে বড়ো কে ছোটো এ নিয়ে যথার্থই আমার মনে কোন আক্ষেপ, কোন উদ্বেগ নেই। রবীন্দ্রনাথ যদি বল্‌তেন আমার কোন বই-ই উপন্যাস-পদবাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করচি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারা জীবন করেছি' এই জন্যেই কোন আক্রমণেরই প্রতিবাদ করি নে। যৌবনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়, বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল ক'রে করেছিলাম।"

কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখার নিন্দা করলে শরৎচন্দ্র খুব ব্যথা পেয়েছেন। তাঁর চোখমুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে।

একখানা মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ভাষার বিরুদ্ধ-সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র সে-বিষয়ে বলেছেন—আরে, ওরা সব ভুলে যায় যে এই গাল দেবার—নিন্দা করবার ভাষাটাই বা ওদের কে শিখিয়েছেন ?

স্পষ্ট প্রমাণ আছে, দু-একদিন জ্বরের ঘোরে শরৎচন্দ্র অনর্গল রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করেছেন, প্রত্যেকটি কবিতা তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থ।

জীবনে অন্তত একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন শরৎচন্দ্র। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে। ১৯৩৬ সালে। রাজনৈতিক কারণে।

কলকাতায় একটি রাজনৈতিক সভায় রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৬ সালের ১৫ জুলাই, ভাষণ দিয়েছেন। ওই সভায় শরৎচন্দ্র বলেছেন: "রবীন্দ্রনাথের এই বিরাট নামের সম্মুখে পিছনে পরিচয়ের কোন বিশেষণ যোগ করা যায় ? বিশ্ব-কবি, কবিসার্ব্বভৌম ইত্যাদি অনেক কিছু মানুষে পূর্ব্বেই আরোপ ক'রে রেখেছে। কিন্তু আমরা—যাঁরা তাঁর শিষ্য-সেবক—নিজেদের মধ্যে শুধু 'কবি' বলেই তাঁর উল্লেখ

করি।—বাইরে বলি রবীন্দ্রনাথ। জানি, সভ্য জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই ব্যক্তিটিকে বোঝবার পক্ষে কারও অসুবিধে ঘটবে না।”

জীবনে রবীন্দ্রনাথ অন্তত একবার এসেছেন শরৎচন্দ্রের বালিগঞ্জের বাড়িতে। ‘রবিবাসর’ নামে বিশিষ্ট সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সপ্তম বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে। ১৯৩৬ সালের ১৯ জুলাই। উত্তরকালে কালিদাস রায় লিখেছেন: “যেদিন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের গৃহে রবিবাসরের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন সেদিন তাঁর জীবনের মহা মহোৎসব। সভা ভাঙ্গবার পর আমি আর সতীশ সিংহ ছিলাম। শরৎচন্দ্র উচ্ছলিত কণ্ঠে বললেন—“আজ আমার গৃহ ধন্য, জীবন ধন্য, আমার লেখনী ধারণও ধন্য হ’ল।”

শরৎচন্দ্রের জয়ন্তী-উৎসব সভায়, ১৯৩৬ সালের ১১ অক্টোবর, রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকেছেন, ভাষণ পাঠ করেছেন। ভাষণ থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি:

“শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন ক’রে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলার ঘরে ঘরে স্বত-উচ্ছ্বসিত। শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার

সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে 'চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয় কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্য্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি'

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, উত্তরকালে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন :

"রবীন্দ্রনাথের উপরে শরৎচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, যখন-তখন বলতেন, "ওঁর লেখা দেখে কত শিখেছি!" কিন্তু আত্মশক্তির উপরেও ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।....শরৎচন্দ্র একদিন বললেন, "সবুজপত্রে রবিবাবুর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস লিখেছেন, তোমরা দেখে নিও, আমি এইবারে যে উপন্যাস লিখব, 'ঘরে-বাইরে'র চেয়ে ওজনে তা একতিলও কম হবে না।" প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রবল প্রতিবাদ ক'রে বললেন, "যে উপন্যাস এখনো লেখেন নি, তার সঙ্গে 'ঘরে-বাইরে'র তুলনা আপনি কী ক'রে করছেন!" কিন্তু শরৎচন্দ্র আবার দৃঢ়স্বরে বললেন, "তোমরা দেখে নিও!" এই উক্তিতে কেবল শরৎচন্দ্রের আত্মশক্তিনির্ভরতাই প্রকাশ পাচ্ছে না, তাঁর সরলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। ....তিনি যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উত্তরকালে কালিদাস রায় লিখেছেন: "বহুদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের রচনার যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান করেন নি, শরৎচন্দ্রের শক্তি স্বীকার ক'রে তিনি কিছুই লেখেন নি, এজন্য এবং অন্যান্য কয়েকটি কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের একটা ক্ষোভ ও অভিমান ছিল। শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনে এ ক্ষোভ ও অভিমান ছিল না। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের প্রতিভা স্বীকার ক'রে মুক্তকণ্ঠে প্রাণ খুলে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে অভিনন্দন পত্র দিয়েছিলেন তা হাতে ক'রে তিনি আমাদের কাছে এসে নিজে প'ড়ে আমাদের বারবার শুনিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর চোখে মুখে যে আনন্দের উজ্জ্বলতা দেখেছিলাম তেমনটি কখনো দেখিনি।"

নকলে চরিত্র অঙ্কন করেছেন, একখানি পত্রে সরল ভাষায় সেকথা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হন নি। এই সরলতা ও অকপটতার জন্যে শরৎচন্দ্রের অনেক দুর্ব্বলতাও মধুর হয়ে উঠত।

হয়তো এই সরলতার জন্যেই শরৎচন্দ্র যে-কোন লোকের যে-কোন কথায় বিশ্বাস করতেন। কারুর উপরে তাঁকে চটিয়ে দেওয়া ছিল খুবই সহজ। তাঁকে বলা হ'ত, "শরৎদা, অমুক লোক আপনার নিন্দা করেছে," তাহলে এ-কথার সত্যাসত্য বিচার না ক'রেই তিনি হয়তো কোন বন্ধুর উপরেও কিছুকালের জন্যে চ'টে থাকতেন এবং নিজেও কষ্ট পেতেন। তারপরে হয়তো নিজের ভুল বুঝে ভ্রম সংশোধন করতেন। মাঝে মাঝে কোন কোন দুষ্ট লোক এই ভাবেই তাঁকে রবীন্দ্রনাথেরও বিরোধী ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত কোন বারেই এইসব অসৎ চক্রান্ত সফল হয়নি।" (হেমেন্দ্রকুমার রায়ঃ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃ. ৮৭-৮৮)

কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে শরৎচন্দ্র ৬২তম জন্মদিনে ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণ থেকে একটুখানি উদ্ধার করিঃ "৬২ বৎসর বয়সে পা দিয়ে আমার জন্মতিথি উপলক্ষে সকলের কাছে আশীর্ব্বাদ চেয়ে নেবার পূর্ব্বে আমার গুরুদেব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—যিনি আজ রোগশয্যায়—তাঁকে প্রণাম করি। এ জগতে সাহিত্য-সাধনায় তাঁর আশীর্ব্বাদ, এটি আমার নয়, প্রতি সাহিত্যিকের পরম সম্পদ। সেই আশীর্ব্বাদ আমি আজকের দিনে, তিনি শুনতে না পেলেও আমি চেয়ে নিলাম।"

রবীন্দ্রনাথের মতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কাছাকাছি মেলবার কোনও সুযোগ হয়নি। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ "কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত।

তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয়নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয় যদি চেনাশোনা হোত তবে ভালো হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত। হয়নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড়ো দিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালোবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।"
